শিশুরঞ্জন

ভারতের ইতিহাস।

(ঐতিহাসিক পাঠ)

শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

Calcutta:
S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,
58 & 12, WELLINGTON STREET.
1912.

[মূল্য ।৶৹ আনা।

ভূমিকা।

ইতিহাস জাতীয় জীবন চরিত। জীবন চরিত পাঠ করিলে যেরূপ এক ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি জানা যায়, সেইরূপ ইতিহাস পাঠ করিলেও সহস্র সহস্র ব্যক্তির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই ইতিহাস পাঠের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারত ইতিহাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘটনা সমষ্টি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী জীবনীর সৃষ্টি করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচারাধীন। মূল রামায়ণ ও মহাভারত, মিল, অর্মি, এলফিনষ্টোন, গ্র্যাণ্টডফ্, ম্যাল্কলম, প্রিন্সেপ, ফর্গুসন, ডাক্তার ফ্লিট, ভিনসেণ্ট স্মিথ, মার্সম্যান প্রণীত ইতিহাস, খ্যাতনামা মহামতি টড্ সাহেবের রাজস্থান, তারিখ-ই-খাঁজাহানলোদী, তারিখ-ই-সেরসাহী, আইন-আকবরী, আনন্দ ভট্ট প্রণীত বল্লাল চরিত, চৈতন্য-চরিতামৃত, অশোক অবদান, শেখ শুভোদয়া, ভাই গুরুদাস প্রণীত জ্ঞানরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে সুকুমারমতি বালকগণের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে, আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ধান্দিয়া, সাতক্ষীরা, খুল্‌না।
ডিসেম্বর, ১৯১১।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

শিশুরঞ্জন

ভারতের ইতিহাস।

রামায়ণ।

পূর্ব্বকালে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন মহিষী ছিল,—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি পুত্র জন্মে; কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রামের সহিত লক্ষ্মণের এবং ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের অত্যন্ত প্রণয় থাকিলেও চারিভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সদ্ভাব ছিল।

বাল্যকালে রাজপুত্রদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, রাজা দশরথ পুত্রগণকে সেইরূপ শিক্ষাদিলেন। তাঁহারা নানা শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে ধনুর্ব্বিদ্যাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। ক্রমে পুত্রগণের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল। সেই সময়ে রাক্ষসবধের জন্য বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষণকে অযোধ্যা হইতে মিথিলায় লইয়া গেলেন। রামচন্দ্র তাড়কা ও সুবাহু প্রভৃতি অনেক রাক্ষসী ও রাক্ষস বধ করিলেন। রাজা জনক তখন মিথিলার রাজা ছিলেন। মুনি রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

জনকের গৃহে শিবের এক ধনুক ছিল। তিনি পণ করিয়াছিলেন, যিনি সেই শিবের ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা সীতার বিবাহ দিবেন। রাম শিবের ধনুক ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলেন ; তাঁহার সহিত সীতার বিবাহ হইল। জনকরাজা লক্ষ্মণের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্ম্মিলার বিবাহ দিলেন। জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ভরতের ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ হইল। দশরথ চারি পুত্র ও চারি বধূ লইয়া মহানন্দে অযোধ্যায় আসিলেন এবং সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

শেষে যখন তিনি বৃদ্ধ হইলেন, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজা করিবার ইচ্ছা করিলেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া অযোধ্যার লোকের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, রাম রাজা হইলে আমরা সুখে থাকিতে পারিব। কিন্তু রাম রাজা হইতে পারিলেন না।

এক সময়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন কৈকেয়ী, দাসী মন্থরার কুপরামর্শে, সেই দুই বর চাহিলেন। একবর,—রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ; আর একবর, নিজ পুত্র ভরতের রাজ্যলাভ। এই কথা শুনিয়া দশরথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অযোধ্যার সকল লোক হাহাকার করিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল, "কৈকেয়ীর কিছুমাত্র দয়া মায়া নাই ; সে রামকে বনে পাঠাইয়া বৃদ্ধ রাজাকে শোকাকুল করিল।"

হরধনুর্ভঙ্গ ।

রাম মিষ্ট কথায় সকলকে বুঝাইয়া জটাবল্কল পরিয়া বনে চলিলেন। পিতার আদেশ পালন করিবেন, তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, লক্ষ্মণ রামকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ও রামের পত্নী সুশীলা সীতা তাঁহার অনুগমন করিলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথ এই দারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিলেন।

নন্দীগ্রামে ভরতের মাতুলালয়। তখন ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলগৃহে ছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলেন, রাম বনে গিয়াছেন। তিনি লোকজন সঙ্গে লইয়া রামকে অযোধ্যায় আনিবার জন্য বনগমন করিলেন। প্রয়াগের দশক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে কহিলেন, "দাদা! মা, না বুঝিয়া আপনাকে বনে পাঠাইয়াছেন, আপনি দেশে চলুন; রাজা হইয়া প্রজা পালন করুন।" রাম কহিলেন, "ভাই, পিতার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আমি রাজ্য ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি, চতুর্দ্দশবর্ষ বনে থাকিব। পিতামাতার আজ্ঞা পালন না করা মহাপাপ। তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, সুখে প্রজা পালন কর। প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম; জননীদিগকে সর্ব্বদা ভক্তি করিও, কখন তাঁহাদের কথার অবাধ্য হইও না, কখন তাঁহাদিগকে কটুবাক্য বলিও না।"

ভরত দুঃখিত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। তিনি রাজা হইলেন, কিন্তু রাজসিংহাসনে বসিলেন না। রামের

পাদুকা দুখানি রাজসিংহাসনে রাখিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ভরতের ন্যায় এরূপ উচ্চমন কয়জনের আছে?

ইহার পর রাম গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী নামে একবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাবণ তখন লঙ্কার রাজা ছিল। পঞ্চবটীর নিকট জনস্থান তাহার অধিকারে ছিল। রাবণের ভগিনী শূর্পনখা পঞ্চবটীতে ভ্রমণ করিতে আসিত। সে একদিন রামকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। রাম লক্ষ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন, লক্ষ্মণ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তখন সে রামের নিকট ফিরিয়া আসিল এবং সীতাকে ভক্ষণ করিতে গেল। রামের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিলেন। রাবণ সেই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে একদিন পঞ্চবটীতে আসিল, তখন রাম ও লক্ষ্মণ কুটীরে ছিলেন না, সে সুযোগ বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল এবং লঙ্কার অশোকবনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল। রাম কিষ্কিন্ধ্যার (মহীশূর) বানরগণের রাজা সুগ্রীব ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সহিত মিত্রতা করিলেন। তাহাদের সাহায্যে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ পরে রাম অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতাকে পরমসতী জানিয়া তাঁহাকে ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

ভরত রামের হাতে রাজ্য দিলেন। রাম সুনিয়মে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিধাতা বোধ হয় সীতার ও

রামের কপালে সুখ লিখেন নাই। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল, রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এই কথা বলিয়া প্রজারা নিন্দা করিতে লাগিল। রাম তাহা শুনিতে পাইলেন। প্রজার মনোরঞ্জন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম; সেই জন্য রাম গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিলেন। সেই বনে বাল্মীকি মুনির আশ্রম ছিল, তিনি সীতাকে কন্যার মত পালন করিতে লাগিলেন। সেইখানে সীতার কুশ ও লব নামে দুই পুত্র হয়। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মুনি রামায়ণ রচনা করেন। তিনি তাহাদিগকে রাময়ণ গান করিতে শিখাইলেন।

কিছুদিন পরে রাম এক যজ্ঞ করেন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। কুশ ও লবের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়া রামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি বাল্মীকির নিকট তাহাদের পরিচয় পাইলেন। মুনি রামকে বলিলেন, "তুমি সীতাকে পুনরায় গ্রহণ কর।" প্রজাদিগের মত লইয়া রাম সীতাকে অযোধ্যায় আনাইলেন। তিনি তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলিলেন। সীতার মনে অতিশয় দুঃখ হইল। তিনি সে দুঃখ সহ্য করিতে পারিলেন না। সীতা বলিয়া উঠিলেন, মা, পৃথিবা, তুমি দুই ভাগে বিভক্ত হও। পৃথিবী বিদীর্ণা হইল; সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাম শোকে মূর্চ্ছিত হইলেন। লব ও কুশ 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অযোধ্যার সকল লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল।

ইহার কিছুকাল পরে রাম ভরতের মাতুল যুধাজিতের

আদেশে ভরতকে সিন্ধুদেশে পাঠাইয়া দেন। ভরত সেখানে যুদ্ধে গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার তক্ষ ও পুষ্কল নামে দুই পুত্রকে সিন্ধুদেশের দুইটী রাজ্যের রাজা করিয়া দিলেন। ঐ দুই রাজ্যের নাম * তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী† হইল। লক্ষণও রামের আদেশে নিজের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের রাজা করিয়া দিলেন। পরে রাম নিজ পুত্র কুশকে কুশাবতীর ও লবকে শরাবতীর এবং শত্রুঘ্নের দুই পুত্র শত্রুঘাতী ও সুবাহুকে মথুরার রাজা করিয়া দিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সুখ ও সাধ পূর্ণ হইল; তিনি সরযূনদীতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মহাভারত।

বালকবালিকাগণ, তোমরা বোধ হয় দিল্লীর নাম শুনিয়াছ। ইহার কিছু পূর্ব্বদিকে হস্তিনাপুর রাজ্য ছিল। শান্তনুনামে হস্তিনাপুরের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সেইজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর দুই রাণী,—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর তিন পুত্র,—যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন। মাদ্রীর দুই পুত্র,—নকুল ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত

---

* বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডির নিকট, † বর্ত্তমান আটকের নিকট। চন্দ্রকেতুরাজার রাজ্য অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান সাহাবাদ। অঙ্গদরাজার রাজ্য বর্ত্তমান সাহারাণপুরের পূর্ব্বে ছিল। কুশাবতী—বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপত্যকায় ছিল। শরাবতী—বর্ত্তমান লাহোর।

পুত্র। পাণ্ডুর পুত্রগণের নাম পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণের নাম কৌরব হইল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজা করিবার ইচ্ছা করেন। দুর্য্যোধনের মন অতি নীচ ছিল। তিনি মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন এবং কৌশল করিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে দুর্য্যোধন এরূপ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন যে, সেই গৃহে আগুণ লাগিলেই দগ্ধ হইয়া যাইবে। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক বিদুরের নিকটে ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি জননী ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চাল রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তখন দ্রুপদ পঞ্চালের রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম দ্রৌপদী। তাঁহার তখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল। দ্রুপদ রাজার একটি পণ ছিল; যে পণ জয় করিবে, সেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে পারিবে। নানাদেশ হইতে রাজারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন সেই পণ জয় করিলেন। তৎপরে মাতার আদেশে পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে দেশে আনাইলেন এবং সমস্ত রাজ্য দুই ভাগ করিলেন। দুর্য্যোধন হস্তিনার এবং যুধিষ্ঠির দিল্লীর নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হইলেন। সকল দেশের রাজারা আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর ধন দিলেন, এবং তাঁহাকে সম্রাটের ন্যায় মান্য করিলেন। যুধিষ্ঠির নানা, রাজ্য জয় করিয়া শেষে এক রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাঁহার উন্নতি দেখিয়া দুর্য্যোধনের অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিল।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলার জন্য এক দিন ডাকিলেন। তিনি রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, স্ত্রী, শেষে আপনাকে পর্য্যন্ত পণ রাখিলেন; কিন্তু প্রত্যেকবার হারিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। কিছুদিন পরে দুর্য্যোধন আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য ডাকিলেন, এবারও তিনি হারিয়া গেলেন। এবার পণ ছিল,—বার বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে লইয়া হস্তিনা হইতে চলিয়া গেলেন; ত্রয়োদশ বর্ষ পরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্য চাহিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য দিতে চাহিলেন না। তৎপরে যুধিষ্ঠির বলিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের পঞ্চভ্রাতাকে * ইন্দ্রপ্রস্থ বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত ও আর যে কোন একখানি এই পঞ্চ গ্রাম দাও।" দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচী পরিমাণ ভূমিও দিতে চাহিলেন না, সুতরাং যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন।

এই যুদ্ধ আঠার দিন ধরিয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সারথি ছিলেন। এই যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সাত জন এবং দুর্য্যোধনের পক্ষে তিন জন মাত্র জীবিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের স্ত্রী গান্ধারী ও যুধিষ্ঠিরের মাতা কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিলেন। কিছু দিন পরে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। একটী সুলক্ষণ

* অপর নাম কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী ও বারণাবত।

অশ্বের মস্তকে জয়পত্র বাঁধিয়া উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অশ্ব যেখানে ইচ্ছা যাইতে লাগিল। ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সৈন্য লইয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অশ্ব যখন যে রাজার রাজ্যে যায়, তিনি তখন হয় উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, না হয় বিনা যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন ; এইরূপে অবাধ্য রাজারা বাধ্য হইলে, একবৎসর পরে অশ্বকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিয়া উহাকে বধ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইল। কিন্তু ইহাতে যুধিষ্ঠির মনে শান্তি পাইলেন না। তৎপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের, আর অর্জ্জুনের পৌত্র এবং অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিলেন। শেষে দ্রৌপদী ও চারিভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাইবার জন্য হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন। একটী কুকুরও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইহাকে মহাভারতে মহাপ্রস্থান বলে। হিমালয় পর্ব্বতে উঠিয়া কিছুদূর গমন করিলে পর, দ্রৌপদী ও চারি ভ্রাতা একে একে প্রাণত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও কুকুর চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে পর, ইন্দ্র রথে চড়িয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখা দিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাও।" তিনি বলিলেন, "দ্রৌপদী ও আমার চারি ভ্রাতাকে সঙ্গে না লইয়া স্বর্গে যাইবার আমার ইচ্ছা নাই।" ইন্দ্র বলিলেন, "তাহারা মৃত্যুরপর তোমার পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছে।" তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দেখুন, এই কুকুর অনেক দিন হইতে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে

আসিতেছে, ইহাকে আমার সহিত স্বর্গে যাইবার আদেশ করুন।" ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "এই আশ্রিত কুকুরটাকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা নাই। যে শরণ লইয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করা মহাপাপ। আমি এরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না।" তখন কুকুর সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কুকুররূপ ধরিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছি। ধর্ম্মকে কোনরূপেই ত্যাগ কর নাই, এই পুণ্যে তুমি এই মনুষ্য শরীর লইয়া স্বর্গে যাইতে পারিবে।" ধর্ম্ম এই কথা বলিবামাত্র ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা যুধিষ্ঠিরকে একখানি সুন্দর রথে চড়াইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

বুদ্ধ ও দেবদত্ত।

তোমরা কাশীর নাম সকলে শুনিয়াছ। উহার প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে কপিলবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। শুদ্ধোদন সেখানকার রাজাছিলেন। বৃদ্ধবয়েসে শুদ্ধোদনের এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ পিতার অত্যন্ত স্নেহের পুত্র ছিলেন। তথাপি তিনি অশান্ত হন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে বৃথা আমোদ প্রমোদ করিতেন না। উত্তম বসন ভূষণে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। কি মানুষ, কি জীবজন্তু সকলকে ভাল বাসিতেন; কাহারও ক্লেশ দেখিতে পারিতেন না, কাহারও দুঃখ দেখিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন, কি করিলে তাহার দুঃখ দূর হয়, তাহার উপায় ভাবিতেন।

ক্রমে সিদ্ধার্থের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ হইল। রাজাপুত্রের যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, শুদ্ধোদন তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিলেন। সিদ্ধার্থের যেমন বুদ্ধি ছিল, তেমনি একমনে সমস্ত বিষয় শিখিতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলেন।

সিদ্ধার্থের এক পিতৃব্যপুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম দেবদত্ত। সিদ্ধার্থ একদিন তাঁহার সহিত উদ্যানে গিয়া তীর ছুড়িতেছিলেন। তখন বর্ষাকাল। একদল হংস আকাশে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া দেবদত্ত তীর ছুড়িলেন। সেই তীর একটি হংসকে বিদ্ধ করিল। হংস ভূতলে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। সিদ্ধার্থ

বুদ্ধ ও দেবদত্ত।

আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, ছুটিয়া গিয়া হংসটিকে কোলে তুলিলেন, অতি সাবধানে বাণটি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন; নানা প্রকারে হংসটির প্রাণরক্ষা হইল। তখন দেবদত্ত সিদ্ধার্থের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি হংসটিকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি, এ হংস আমার।" সিদ্ধার্থ বলিলেন, "আমি যখন হংসটিকে বাঁচাইয়াছি তখন এ হংস আমার; আমি তোমাকে দিব না।" তখন উভয়ে বৃদ্ধ রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ হংসটি কাহার? রাজমন্ত্রী সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন 'দেবদত্ত, তুমি ত ইহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলে, সিদ্ধার্থ ইহাকে বাঁচাইয়াছে, সুতরাং এ হংস সিদ্ধার্থের; বিবাদের মীমাংসা হইল। সিদ্ধার্থ হংসটিকে অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

আজ হংসটির জন্য সিদ্ধার্থেব প্রাণ কাঁদিল; কিন্তু একদিন সমস্ত মনুষ্যের দুঃখের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া ছিল। তিনি পিতার একমাত্র স্নেহের পুত্র ছিলেন, তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। তিনি লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি সমস্ত ত্যাগ করিলেন। কখন বৃক্ষের তলায় শয়ন করিয়া, কখন ভিক্ষার অন্ন ভোজন করিয়া, তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; লোককে ভাল উপদেশ দিয়া সুখী করিতে লাগিলেন। কখনও কাহাকে ক্লেশ দিওনা, বৃথা আমোদ প্রমোদ করিও না; পরের দ্রব্য চুরি করিও না,

মিথ্যা কথা কহিও না, সর্ব্বদা সৎপথে চলিবে,—এই সকল তাঁহার উপদেশ ছিল। তিনি মিষ্ট কথায় লোককে সুন্দররূপে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। আশীবৎসর বয়সে গোরক্ষপুরের ১৭ ক্রোশ পূর্ব্বে কুশীনগরে এক বটবৃক্ষতলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার।

গ্রীসদেশের মধ্যে ম্যাসিডন নামে একটী স্থান আছে। আলেকজাণ্ডার সেখানকার রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ফিলিপ; মাতার নাম ওলিম্পিয়াস। তিনি বিশবৎসর বয়সে রাজা হইয়া সমস্ত গ্রীস দেশ জয় করেন। পরে অন্যান্য দেশ জয় করিতে বহির্গত হন। সেই সময়ে তিনি আন্তিপেতর নামে একব্যক্তির উপর গ্রীস রাজ্য দেখিবার ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মাতা লোকজনকে অত্যন্ত কটূ কথা বলিতেন। ক্রমে তাঁহার ব্যবহার সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল। আন্তিপেতর বিরক্ত হইয়া আলেকজাণ্ডারকে পত্র লিখিলেন, "আপনার মাতার অত্যাচার আর কেহ সহ্য করিতে পারিতেছে না, আপনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া পত্র লিখুন।" আলেকজাণ্ডার তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, "আন্তিপেতর, তুমি জান, আমার মাতার এক বিন্দু চক্ষের জল, তোমার এরূপ শত শত পত্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে? তুমি তাঁহার অবাধ্য হইয়া কোন কার্য্য করিও না, তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিও

না"। তোমরা দেখিলে, আলেকজাণ্ডার মাতাকে কিরূপ ভক্তি করিতেন। আবার তিনি গুণীলোকের কিরূপ সম্মান করিতেন, সে বিষয়ে তোমাদিগকে একটী ঘটনা বলিব, মন দিয়া শুন। তোমরা পূর্ব্বে তক্ষশিলার নাম শুনিয়াছ; আলেক জাণ্ডার নানাদেশ জয় করিয়া শেষে আমাদের দেশে আসিয়া-ছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় আসিলে, তক্ষশিলার রাজা তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। শেষে তিনি পুরু নামে এক রাজার রাজ্যের নিকটে আসিলেন; কিন্তু পুরু তাহাতে ভয় পাইলেন না। তিনি যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। পুরুর রাজ্য বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যে ছিল। আলেকজাণ্ডার বিতস্তা নদীর পূর্ব্বপারে সৈন্য লইয়া রহিলেন। বিতস্তা নদীতে তখন বন্যা হইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের এক ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে আলেকজাণ্ডার গোপনে ঐ রাজ্যের মধ্য দিয়া নদী পার হইয়া পুরুর রাজধানীর নিকটে আসিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। পুরুর পুত্র এই যুদ্ধে হত হইলেন। যুদ্ধের সময় পুরু নয়বার ভয়ানক আঘাত সহ্য করিয়া শেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় গ্রীকেরা পুরুকে বন্দী করিয়া আলেকজাণ্ডারের নিকটে লইয়া গেল। পুরুর চৈতন্য হইলে, আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করেন?" পুরু নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "আপনিও রাজা, আমিও রাজা, আপনি আমার প্রতি অবশ্য রাজার মত সম্মান দেখাইবেন।" পুরুর এইরূপ কথা শুনিয়া

আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শেষে অন্য অন্য স্থান জয় করিয়া সেগুলিও তাঁহাকে দিয়াছিলেন। দেখিলে, যিনি নিজে মহান্, তিনি মহতের বিশেষ আদর ও সম্মান করেন।

চন্দ্রগুপ্ত।

মগধরাজ মহাপদ্মের মুরা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। মহাপদ্মের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মহানন্দ মগধের রাজা হন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ভয়ে চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া বিতস্তা নদীর তীরে আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মগধরাজ্যের সমৃদ্ধির কথা বলিয়া আলেকজাণ্ডারকে উক্ত রাজ্য জয় করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের নিকটে থাকিয়া তাঁহার যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে সবল ও সাহসী পঞ্জাবীদিগকে লইয়া এক সেনাদল গঠন করেন। কিছুদিন পরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইল। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধিবলে সিন্ধু ও পঞ্জাববাসীরা গ্রীকদিগকে অতি সহজে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেয়।

এই সময়ে মহানন্দ একদিন কোন কারণে চাণক্য নামে এক বুদ্ধিমান পণ্ডিতের শিখা ধরিয়া রাজসভা হইতে উঠাইয়া দেন।

চাণক্য নিরপরাধ ছিলেন। তিনি শিখা উন্মুক্ত করিয়া সকলের সম্মুখে বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্ত মহানন্দ, তুমি সকলের সম্মুখে আমাকে যেমন অপমানিত করিলে, ইহার প্রতিফল তোমাকে একদিন ভোগ করিতে হইবে। আর সভাজন, আপনারাও শুনিয়া রাখুন, যতদিন নন্দবংশ ধ্বস করিতে না পারিব, ততদিন আমার এ শিখা উন্মুক্ত থাকিবে।" এই কথা বলিয়া চাণক্য মগধ হইতে চলিয়া গেলেন এবং পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় লইলেন। এই চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের রাজা হন।

আলেকজাণ্ডারে মৃত্যুর পর, তাঁহার এসিয়া মহাদেশের রাজ্য সেলুকস নামক একজন সেনানীর হস্তে পড়ে। সেলুকস ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু গ্রীকেরা পরাজিত হইল। সেলুকস কেবল পাঁচশত হস্তী উপহার লইয়া হিরাট হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রীক রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে দান করেন, তাঁহার সহিত নিজের এক কন্যার বিবাহ দেন, তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল গ্রাক সেনা এবং তাঁহার রাজসভায় একজন গ্রীক দূত রাখিয়া গেলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ মেগাস্থিনিস। ইনি এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, সেই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়।

চন্দ্রগুপ্ত সুনিয়মে প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছিল। সকলে শান্ত শিষ্ট ও সত্যবাদী ছিল, চুরী ডাকাইতি দেশের মধ্যে ছিল না। অপরাধীরা কারাদণ্ড ভোগ করিত, কোন কোন অপরাধে মস্তক

মুণ্ডনের ব্যবস্থা ছিল। লোকে এই দণ্ডকে গ্লানিজনক মনে করিত। চন্দ্রগুপ্ত ২০বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন।

মহারাজ অশোক।

মহারাজ বিন্দুসার মগধের রাজা ছিলেন। পাটলী পুত্র-নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। চম্পাপুরী নামে এক নগরী ছিল, সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার এক সুলক্ষণা পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী রাখিলেন। তিনি পরম আদরে কন্যাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালিকা কন্যা একদিন সমবয়স্কা সঙ্গিনীদিগের সহিত গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন, এক বকুল তলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া সকলের হাত গণনা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল বালিকা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহারা হাত গণাইতে লাগিল। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গী অবনতমুখে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী সুভদ্রাঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! তুমি যে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না? এস মা, এইবার তোমার হাত দেখিব।" সুভদ্রাঙ্গী নিকটে গেলেন; সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার হাত দেখিলেন। তৎপরে বলিলেন, "মা, যদিও তুমি গরিবের মেয়ে, কিন্তু মা, তুমি রাজরাণী হইবে।" সঙ্গে যে সকল বালিকারা ছিল, তাহারা সকলে

অসম্ভব বিবেচনা করিয়া হাসিতে লাগিল। সুভদ্রাঙ্গী কোন উত্তর করিলেন না, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট সমস্ত কথা বলিলেন। দরিদ্র পিতার আনন্দের আর সীমা রহিল না। ইহার কিছুদিন পরে একজন প্রসিদ্ধ গণক একদিন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কন্যার ভাগ্য গণনা করিতে বলিলেন। তিনি ভাগ্য গণনা করিয়া বলিলেন, "আপনার কন্যা একজন বড় রাজার রাণী হইবেন।" তখন আর ব্রাহ্মণের কোন সন্দেহ রহিল না। মহারাজ বিন্দুসারকে প্রবল রাজা ও পরম সুন্দর পুরুষ জানিয়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে লইয়া পরদিন প্রাতঃকালে পাটলীপুত্র নগরীতে চলিলেন। ব্রাহ্মণ সুভদ্রাঙ্গীকে লইয়া মহারাজ বিন্দুসারের সহিত গোপনে দেখা করিলেন এবং গণক যেরূপ গণনা করিয়া বলিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। মহারাজ বিন্দুসার ব্রাহ্মণের কথায় বালিকাটীকে রাজবাটীতে আশ্রয় দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে সুভদ্রাঙ্গীর কথা রাজরাণীরা শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের মনে ঈর্ষ্যা হইল; সকলে স্থির করিলেন, ইহাকে নীচকার্য্য করিতে দেখিলে মহারাজ আর ভাল বাসিবেন না; তাহা হইলে তিনি ইহাকে বিবাহও করিবেন না। এই মনে করিয়া রাজরাণীরা সকলে মুখে সুভদ্রাঙ্গীর উপর ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন। সুভদ্রাঙ্গী তাঁহাদিগের চাতুরী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়া ক্ষৌরকার্য্য মন দিয়া শিখিতে লাগিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে সুন্দররূপে শিখিলেন। একদিন রাণীরা

পরামর্শ করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবার জন্য সুভদ্রাঙ্গীকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, তুমি কি চাহ বল, আমি তোমাকে তাহাই দিব।" সুভদ্রাঙ্গী সুযোগ বুঝিয়া নিজের ইচ্ছা জানাইলেন। রাজা প্রথমে তাঁহাকে নাপিতের কন্যা মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে রাজরাণী হইবার ইচ্ছা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তখন সুভদ্রাঙ্গী রাজাকে নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা রাণীদিগের সমস্ত মন্ত্রণা বুঝিতে পরি-লেন। ব্রাহ্মণের নিকট তিনি যে শপথ করিয়াছেন, তাহা মনে পড়িল। তিনি শুভদিন দেখিয়া সুভদ্রাঙ্গীকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে সুভদ্রাঙ্গীর একটী পুত্র সন্তান হইল। পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি পূর্ব্বে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, সমস্ত ভুলিয়া গেলেন; সেইজন্য পুত্রের নাম অশোক রাখিলেন। রাজকুমার দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন না, তাঁহার প্রকৃতি উগ্র ছিল, যে বস্তু পাইবার ইচ্ছা হইত, সম্মুখে তাহা না পাইলে তাঁহার ক্রোধের আর সীমা থাকিত না; সামান্য কারণে তিনি রাগ করিতেন, দাসদাসীগণের উপর উৎপাত করিতেন; তাঁহার ব্যবহারে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে 'চণ্ড' এই নূতন নাম দিল। অশোক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একসময়ে তক্ষশিলার প্রজারা বিন্দুসারের অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, অশোক তাহাদিগকে দমন করেন। মহারাজ বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে, তিনি মগধের রাজা হন। সুভদ্রাঙ্গী

এতদিনে রাজমাতা হইলেন। অশোক উপগুপ্তাচার্য্যের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে মন দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'ধর্ম্মাশোক' ও প্রিয়দর্শী, এই নাম দিয়াছিল। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে রাজপথ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করান, মনুষ্য ও পশুদিগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার রাজ্যের মধ্যে পর্ব্বত গাত্রে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ ক্ষুদিয়া দেন। এইগুলিকে অশোকের অনুশাসন বলে।

বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ

বিক্রমাদিত্য মালবদেশের রাজা ছিলেন। এই রাজ্য বিন্ধ্য ও আরাবলা পর্ব্বতের মধ্যে ছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী। তাঁহার প্রকৃত নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; তিনি অনেক রাজ্য জয় করেন। তিনি বিদ্যার আদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহার সভায় নয়জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে নবরত্ন বলিত। বিক্রমাদিত্য একজন সুবিচারক রাজা ছিলেন। তিনি যে সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেন, তাহার নাম বত্রিশ সিংহাসন ছিল। এই বত্রিশ সিংহাসনের সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে, চারি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার রাজধানী বন জঙ্গলে পূর্ণ হইল। একদিন সেই বনে

কয়েকজন রাখাল বালক খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে দুইজন বালক কলহ করিতে আরম্ভ করিল। রাখাল বালকগণের মধ্যে একজন রাজা হইল এবং এই দুইজন বালকের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য একটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর বিচার করিতে বসিল। অপর কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহারা রাখালরাজার বিচার শুনিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইল। রাখালরাজা ঐ দুইজন বালকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কাহার ন্যায় কাহার অন্যায় মীমাংসা করিয়া দিল। তখন রাখাল রাজার বিচার দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। এই কথা সকলে শুনিতে পাইল; ক্রমে সেই রাখাল-রাজার নিকট বিচারের জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সকলেই রাখালরাজার নিকট সুবিচার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। তখন ভোজরাজ উজ্জয়িনীর কিছু দূরে ধারা নামক স্থানের রাজা ছিলেন; তিনি ও কিছুদিন পরে এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি তাঁহার অমাত্যগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন বৃদ্ধ অমাত্য উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এইখানে পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। আমার বিশ্বাস যে মৃত্তিকাস্তূপের উপর বসিয়া রাখাল রাজা বিচার করিতেছে, উহার নিম্নে রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন রহিয়াছে। সেই স্থানের কোন গুণ না থাকিলে, সামান্য রাখাল বালক কখনই ঐরূপ সুবিচার করিতে পারে না।

রাজা সেই স্থান খনন করিবার জন্য আদেশ করিলেন অবশেষে সেই স্থানে এক সিংহাসন পাওয়া গেল। তখন রাজার

আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মনে করিলেন, আমি এই সিংহাসনে বসিয়া সুবিচার করিব। তিনি সেই সিংহাসন পরিষ্কার করিয়া রাজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন।

ঐ সিংহাসনের এক এক দিকে আট আট পুত্তলিকা এবং প্রত্যেক পুত্তলিকার হস্তে এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ছিল। এই সকল পুত্তলিকার এমন রূপ যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় না যে, তাহাদের জীবন নাই।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, রাজা সিংহাসনে বসিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বত্রিশটী পুত্তলিকা হাসিয়া উঠিল; ভোজরাজ বিস্মিত হইলেন। তাহারা একে একে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! প্রথমে আমাদের কথার উত্তর দিয়া পরে সিংহাসনে বসুন। "আপনি কি এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য? আপনি কি অন্য রাজাদের রাজ্য ও ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই? যাহা অন্যায় বলিয়া জানিয়াছেন, এরূপ কার্য্য কি কখন করেন নাই? আপনার মন কি বালকের ন্যায় পবিত্র ও নিষ্পাপ? আপনি কি একজন যোগ্যরাজা?" বত্রিশদিনে বত্রিশটী পুত্তলিকা ভোজরাজকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণ বর্ণনা করিল। দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা বলিল, "যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন, তিনি সে কার্য্য করিতে গেলে কেবল যে, সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না এমন নহে, পৃথিবীর সকল লোকে তাঁহাকে শতমুখে নিন্দাও করিয়া থাকে। হে ভোজরাজ!

আপনার অনেক গুণ আছে সত্য, কিন্তু আপনার কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা বিবেচনা না করিয়াই দেবতুল্য মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা অতি অন্যায় কর্ম্ম বলিতে হইবে।”

পুত্তলিকার এইকথা শুনিয়া ভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিলেন এবং মন্ত্রীকে বলিলেন, “আমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহি; সুতরাং যে স্থানের সিংহাসন সেইখানেই রাখিয়া আইস।”

কালিদাস।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে নবরত্ন বলিত। তাঁহাদের নাম,—কালিদাস, বররুচি, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ ও বরাহমিহির। লোকমুখে শুনা যায়, কালিদাস বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, লেখা পড়ায় তাঁহার কিছু মাত্র মন ছিল না। কিন্তু শেষে তিনিই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে তাঁহার সভাপণ্ডিত করিলেন, এবং কালিদাসই তাঁহার নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী গল্প তোমাদিগকে বলিতেছি, শুন।

একদিন কালিদাস আপন গৃহে বসিয়া পুত্রকে পড়াইতেছেন; এমন সময়ে, রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে আসিলেন।

কালিদাস পুত্রের পাঠবন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহাসম্মান করিয়া রাজাকে বসাইলেন। রাজা কালিদাসকে বলিলেন, "তোমার পুত্রকে পড়াও, পাঠ বন্ধ করিও না।" কালিদাসের ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু কি করেন, রাজা আদেশ করিতেছেন, সুতরাং তিনি পুত্রকে পড়িতে বলিলেন। পুত্র পড়িল,—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

রাজা মনে করিলেন, কালিদাস মহাপণ্ডিত, আর আমি পণ্ডিত নহি, একজন রাজা। পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মান সকল স্থানে; কিন্তু রাজার সম্মান কেবল নিজের দেশে; কালিদাস পুত্রকে পড়াইবার ছলে আমাকে এই শিক্ষা দিল। রাজা আর কিছু না বলিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; কালিদাস রাজার অপ্রিয় হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন, কালিদাসের সমস্ত ধন রাজ ভাণ্ডারে লইয়া আইস। কালিদাস মহাকষ্টে পড়িলেন; তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশত্যাগ করিলেন, এবং এদেশ ওদেশ করিয়া শেষে কর্ণাটরাজের নিকট গেলেন। কর্ণাটের রাজা কালিদাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া নিজের সভায় রাখিলেন।

এদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে হারাইয়া মনের দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না; তখন রাজা সন্ন্যাসীর বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে কর্ণাট দেশে গিয়া কালিদাসের সন্ধান পাইলেন। কিন্তু তখন রাজার নিকট একটী বহুমূল্য হীরকের অঙ্গুরী ব্যতীত আর কিছুই ছিল

না ; তিনি উহা একজন মণিকারের দোকানে বিক্রেয় করিতে গেলেন। মণিকার একজন সন্ন্যাসীর নিকট বহুমূল্য হীরকের অঙ্গুরী দেখিয়া চোর মনে করিয়া নগরপালের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেল। নগরপাল বিক্রমাদিত্যকে তাড়না করিতে করিতে রাজার নিকট লইয়া গেল। কালিদাস রাজাকে চিনিতে পারিয়া কর্ণাটরাজের নিকট তাঁহার পরিচয় দিলেন। কর্ণাটরাজ বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত সম্মান করিলেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল,—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

হর্ষবর্দ্ধন।

হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য জয় করেন। তাঁহার এক ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম রাজ্যশ্রী। হর্ষবর্দ্ধনের ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা প্রায় দেখা যায় না। তোমরা এলাহাবাদের নাম শুনিয়াছ, এখানে গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতী এই তিন নদী মিলিত হইয়াছে। এইস্থানে হিন্দুদিগের প্রয়াগতীর্থ। হর্ষবর্দ্ধন প্রয়াগতীর্থে এক উৎসব করিতেন। উৎসবক্ষেত্রের নাম "সন্তোষক্ষেত্র" ছিল। এই উৎসব ৭৫ দিন ধরিয়া হইত। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্ম ভাল বাসিতেন। সন্তোষক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল ; প্রথমদিন সেই মন্দিরে বুদ্ধের মূর্ত্তি, দ্বিতীয় দিন বিষ্ণু ও তৃতীয় দিন শিবের মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা

করা হইত। রাশি রাশি বস্ত্র, ও রাশি রাশি ধন দান করিবার জন্য সেখানে সঞ্চিত থাকিত।

পঁচাত্তর দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র লোককে প্রচুর দান করা হইত। দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় সকলে আসিয়া সন্তোষক্ষেত্রে দান লইয়া যাইত এবং উদর পূর্ণ করিয়া উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিত।

চারিসহস্র বর্গফিট ভূমি ব্যাপিয়া এই সন্তোষক্ষেত্র ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে গোলাপফুলের গাছে বেষ্টিত ; তাহার চতুস্পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ কক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য কার্পাস এবং রেশমের মূল্যবান্ বস্ত্র সকল, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাশি রাশি সঞ্চিত থাকিত ; ভোজন গৃহ সকল বাজারের দোকানের মত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাঁধা হইত। এক এক গৃহে সহস্র লোক বসিয়া একেবারে ভোজন করিতে পারিত। দস্যুতস্করে এই সকল ধনরত্ন লুট পাট করিয়া লইয়া যাইতে না পারে, সেইজন্য ধ্রুবপতু নামে এক রাজা, আসামের রাজপুত্র এবং হর্ষবর্দ্ধন নিজে সৈন্য লইয়া চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেন।

উৎসবের শেষদিনে হর্ষবর্দ্ধন নিজের বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণি, মুক্তা, হীরকের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া সেই সকল দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তখন রাজ্যশ্রী তাঁহাকে একখানি ছিন্নবস্ত্র আনিয়া দিতেন। হর্ষবর্দ্ধন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, করজোড়ে সকলের সম্মুখে বলিতেন, "আজ আমি ধন্য ; আজ আমার এত ধনরত্ন সমস্ত সার্থক ; আজ আমার রাজা হওয়া সার্থক ; ধন রত্নের ভাবনা আজ আমার ঘুচিল।

আবার দান করিবার জন্য আমি ধন রত্ন সঞ্চয় করিব।”
আহা! এমন রাজার কথা কেহ কি কখন শুনিয়াছ?

হর্ষবর্দ্ধনের অন্য নাম শিলাদিত্য। তিনি ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট।

হাসান ও হুসেন।

মুসলমানেরা মহম্মদের শিষ্য। আরবদেশে তাঁহার জন্ম হয়। মহম্মদের এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম ফাতেমা; আলির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ফাতেমার দুই পুত্র হাসান ও হুসেন। মহম্মদের স্ত্রীর নাম আয়েসা, তাঁহার শ্বশুরের নাম আবুবেকর। মহম্মদের মৃত্যু হইলে, অনেক ভক্ত আবুবেকরকে এবং আর এক দল আলিকে খলিফা করিতে চাহিল। এইরূপে মুসলমানদিগের দুই দল হইল—সুন্নি ও সিয়া।

আবুবেকরের পর ওমার, তৎপরে, ওস্মান খলিফা হন। শেষে আলি মদিনায় খলিফা হইলেন। তখন মহম্মদের স্ত্রী আয়েসা জীবিতা ছিলেন। মাবিয়া নামে মহম্মদের একজন শিষ্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়া বাধ্য করিল। সে দামস্কসে আপনাকে খলিফা বলিয়া প্রচার করিল; মাবিয়া ক্রমে দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। মিশরদেশ আলির রাজ্যমধ্যে ছিল, সে তাহা অধিকার করিল। তখন আলি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে মাবিয়া কৌশল করিয়া আলিকে গোপনে হত্যা করিল। আলি ধার্ম্মিক

লোক ছিলেন, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করার জন্য মাবিয়ার দলের অনেক লোক তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল এবং কিছু দিন পরে সে প্রাণত্যাগ করিল। আলির মৃত্যুর পর হাসান মদিনার খলিফা হইয়াছিলেন। এখন মাবিয়ার পুত্র এজিদ্ দামস্কসের খলিফা হইল। তাহার আদেশে তাহার দলের একব্যক্তি গোপনে বিষপান করাইয়া হাসানকে হত্যা করিল। তখন হুসেন মদিনায় খলিফা হইলেন, এজিদ্ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল; 'হুসেন তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করুন,' এই কথা বলিয়া সে তাঁহার নিকট লোক পাঠাইল। হুসেন বলিলেন, "সে ধার্ম্মিক হইলে তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু সে দুর্ব্বৃত্ত; সতত অন্যায় কার্য্যে রত, সুতরাং তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া এজিদের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। সে হুসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিল। ফোরাৎ নদীর তীরে কার্ব্বালা নামক স্থানে হুসেনের সহিত এজিদের এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই ফোরাৎ নদীর শেষে ইউফ্রেটিস নাম হইয়াছে। এইরূপ শুনা যায় যে, হুসেন ও তাঁহার সৈন্যেরা যাহাতে জল পান করিতে না পারে, সেই জন্য এজিদ্ ফোরাৎ নদীর জলস্রোত বন্ধ করিয়া দেয়। হুসেন দশদিন অনাহারে ও তৃষ্ণায় ক্লেশ পাইয়া কার্ব্বালার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। হাসান ও হুসেনের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার জন্য মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্ব হইয়া থাকে।

তোমরা মুসলমানদিগের মহরমপর্ব্ব দেখিয়াছ? কত মশাল ঘুরান হয়, লাঠি ও তরবাল খেলা হয় এবং কত তাজিয়া বাহির হয়। ভক্ত মুসলমানেরা মার্সিয়া পাঠ করেন। পড়িতে পড়িতে একটু বিশ্রাম করেন; সেই সময়ে সকলে 'হাসান হুসেন' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করেন। 'বারদিন ধরিয়া মুসলমানদের এই উৎসব হয়। ধনী মুসলমানগণ দরিদ্রদিগকে প্রচুর খাদ্য ও ধন দান করেন।

ডাহির।

ডাহির সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন। আরবদেশে তখন ওয়ালিদ খলিফা ছিল। তাঁহার সময়ে সিন্ধুদেশে দেওয়াল নামে একটী বন্দরে আরবদিগের একখানি জাহাজ বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল।

তখন এই দেশে দস্যুর অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। দস্যুরা ঐ জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া লইয়া গেল। আরবেরা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না, তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হইল।

সেই সময়ে হেজাজ পারস্যের রাজা ছিলেন। তিনি ডাহিরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে আরবদিগের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। ডাহির বলিলেন, "যেখানে জাহাজ লুট হইয়াছে সে স্থান আমার রাজ্যের মধ্যে নহে; সুতরাং আমি ক্ষতি পূরণ করিব না।"

হেজাজ তাঁহার জামাতা বিন কাশিমকে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সিন্ধুদেশে জাঠনামে একজাতি বাস করিত; তাহারা গোপনে কাশিমের সঙ্গে যোগ দিল। ডাহিরের সহিত মুসলমানদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার দুই পুত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হইয়া চিতোরের দিকে পলায়ন করিলেন। ডাহিরের স্ত্রী এবং তাঁহার পুত্রবধূ মুসলমানদিগের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ডাহিরের ভগিনী একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইলেন। শেষে রাজপুরীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। শুনা যায়, ডাহিরের দুই কন্যা সূর্য্য ও পরিমল ইচ্ছা করিয়া ধরা দেন। কাশিম তাঁহাদিগকে খলিফা ওয়ালিদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। খলিফা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে, সূর্য্যা বলিলেন, "আমরা রাজার কন্যা, আপনি বোগদাদের সুলতান, আপনাকে বিবাহ করিতে আমাদের আপত্তি কি? কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের একটী পণ আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। কাশিম আমাদিগকে বন্দী করিবার পর বিবাহ করিতে চায়; তখন আমি তাহাকে বলিলাম আমরা রাজার কন্যা, সুলতানকে বিবাহ করিতে পারি; তুমি তাঁহার একজন সেনাপতি, তোমাকে কিরূপ করিয়া বিবাহ করিব? কাশিম ক্রোধবশে আমাদিগকে অত্যন্ত পীড়ন করে। আমরা তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে বলিলাম, দেখ তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমাদিগকে বিবাহ কর, আমরা যে কোন

উপায়ে সুলতানের নিকট একথা জানাইব, তখন তোমার নিস্তার নাই। কিন্তু যদি তুমি আমাদিগকে সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সিন্ধু দেশের রাজা করিয়া দিতে পারেন। জানি না, কাশিম কি ভাবিয়া আমাদের কথায় সম্মত হইল। আমরা এই কৌশল করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে আপনি, কাশিম আমাদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার শাস্তি বিধান করুন।” সুলতান রাজকন্যাদ্বয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। শেষে কাশিমকে চর্ম্ম মশকে পুরিয়া মুখবন্ধ করিয়া বোগদাদে পাঠাইবার জন্য আদেশ দিলেন। সুলতানের আদেশ মত কার্য্য হইল। পথেই কাশিমের মৃত্যু হয়। কাশিমের মৃতদেহ সুলতানের নিকট নীত হইলে, রাজকন্যা সূর্য্য বলিলেন, “কাশিম আমাদিগকে বন্দী করিবার পর মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছে, কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, কিন্তু এই কাশিম, আমার পিতার রাজ্য নষ্ট করিয়াছে, আমার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলকে বধ করিয়াছে, দুষ্টের উচিত শাস্তি হইল। আমরা হিন্দু জাতি, রাজার কন্যা, সত্য বই মিথ্যা জানি না, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু আপনার নিকট মিথ্যাকথা বলিয়াছি, এই পাপের এক মাত্র শাস্তি আমাদের প্রাণদণ্ড, আপনি সেই দণ্ড বিধান করুন ; আমারা হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া যাই। আর আপনাকেও ধিক্, যে আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার একজন প্রধান সেনাপতির প্রাণ

বধ করিলেন।” সুলতান রাজকন্যার কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। শেষে তাহাদিগকে একটী গৃহে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন। এই গৃহেই রুদ্ধ থাকিয়া সূর্য্যও পরিমল দেবী প্রাণ ত্যাগ করেন।

আদিশূর ও রাণীচন্দ্রমুখী।

আদিশূর গৌড়ের রাজা ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহার নাম চন্দ্রমুখী। এক সময়ে আদিশূরের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হেতু শস্য জন্মিতে পারিল না, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; রাজ্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন রাণী চন্দ্রমুখী আদিশূরকে বলিলেন, “দেখ রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। সদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাগ যজ্ঞ কর, তাহা হইলেই রাজ্যের মঙ্গল হইবে।” তখন বাঙ্গালা দেশে সদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কান্যকুব্জে অনেক সদ্ ব্রাহ্মণ বাসকরিতেন; তাঁহারা যেমন জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও উত্তম ছিল। আদিশূর তাঁহার শ্বশুর চন্দ্রকেতুকে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি পাঁচজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহারা আসিয়া যজ্ঞ করিলে, রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা অনেক অর্থ

পাইয়াছেন শুনিয়া প্রতিবেশী ব্রহ্মণদিগের ঈর্ষ্যা হইল। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা বৈদ্যরাজার পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছ; তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিবনা।" তখন তাঁহারা রাজা চন্দ্রকেতুকে সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে গোলযোগ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তৎপরে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দাসদাসী লইয়া নৌকাপথে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। আদিশূরের অত্যন্ত আনন্দ হইল; তিনি গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মিলন স্থানে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম দিলেন। তাঁহাদিগের বাসের জন্য গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের বাসগৃহের নিকটেই দাসদাসীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বাঙ্গালাদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ দেখিতে পাও, তাঁহারা ইঁহাদিগের সন্তান সন্ততি।

কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন, তাঁহাদের নাম—ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের নাম, ক্ষিতিশ, মেধাতিথি, সুধানিধি, সৌভরি ও বীতরাগ। তাঁহাদের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম,—মকরন্দ ঘোষ, দাশরথি বসু, বিরাটগুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। বাঙ্গালার কায়স্থগণ ইঁহাদেরই সন্তানসন্ততি।

সবুক্তগিন।

সবুক্তগিন্ আফগানিস্থানের রাজা ছিলেন। তোমরা যে কাবুলীদিগকে পথে ঘাটে দেখ, উহারা আফগানিস্থানের লোক। সবুক্তগিন দরিদ্রের পুত্র ছিলেন; বাল্যকালে তিনি অশ্বারোহণে চতুর্দ্দিকে শিকার করিতে বাহির হইতেন। একদিন শিকারে গিয়া দেখিলেন, একটী সুন্দর হরিণশাবক তাহার মাতার সহিত ভ্রমণ করিতেছে। সবুক্তগিন কৌশল করিয়া হরিণ শাবকটীকে ধরিলেন; এবং তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু হরিণী কাতর ভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি হরিণশাবকের বন্ধনমোচন করিয়া দিলেন; হরিণীর অত্যন্ত আনন্দ হইল। সে শাবকটীকে সঙ্গে লইয়া এরূপ ভাবে সবুক্তগিনের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল যে, তাহার সেই ভাব দেখিয়া তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, যেন হরিণী আনন্দে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছে।

সেই দিন রাত্রে সবুক্তগিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং মহম্মদ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, "ওহে আমীর, তুমি আজ হরিণশিশুর উপর যে দয়া দেখাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তুমি নিশ্চয়ই রাজা হইবে। কিন্তু এই কথা মনে রাখিও, যেন তোমার প্রজাগণের উপর এইরূপ দয়া দেখাইতে পরাঙ্মুখ না হও; কারণ দয়াই রাজার শ্রেষ্ঠ গুণ।

রাজারা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, আর তাঁহাদের মৃত্যুর পরও তাঁহারা এই দয়া গুণেরই ফল ভোগ করিয়া থাকেন।"

পরে সবুক্তগিনের সহিত আফগানিস্থানের রাজকন্যার বিবাহ হইল। তিনি শেষে নিজে আফগানিস্থানের সুলতান হইলেন। তাঁহার একটী পুত্র হইল; মহম্মদের নামানুসারে তাঁহার নাম মামুদ রাখিলেন। সবুক্তগিন পঞ্জাবের রাজপুত রাজাদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সুলতান মামুদ।

মামুদ গজনীর রাজা ছিলেন। তিনি সপ্তদশবার ভারতবর্ষ জয় করিতে আগমন করেন। মামুদ হিন্দুদিগের অনেক দেবমন্দির লুণ্ঠন করেন; অনেক দেবমূর্ত্তিও ধ্বংস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অশেষ গুণ ছিল; তিনি লেখাপড়ার আদর করিতেন, যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন। তাঁহার সভায় পারস্য দেশের একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ফার্দ্দূসী; তিনি একখানি সুবৃহৎ পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তকে ষষ্টি সহস্র শ্লোক ছিল, মামুদ তাঁহাকে শেষে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

একদিন এক বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে বলিল, "দস্যুগণ পারস্য দেশের মরুভূমিতে তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে"। মামুদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তাঁহার

রাজধানী হইতে পারস্য অনেক দূরে; সুতরাং সেখানকার দস্যুদিগকে দমন করা অতিশয় কঠিন।” তখন বৃদ্ধা ক্রোধে বলিল, “মহারাজ! আপনি পারস্য রাজ্য জয় করিয়াছেন কেন? যতটুকু রাজ্য আপনি ভাল করিয়া শাসন করিতে পারিবেন, ততটুকু রাজ্য জয় করিবেন; অধিক রাজ্য জয় করিবেন না।” বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মামুদ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে প্রচুর অর্থ দিলেন। একদল সৈন্য পারস্যের মরুভূমিতে পাঠাইয়া দিয়া, দস্যুগণ বণিকদিগকে যাহাতে হত্যা করিতে না পারে, তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে না পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মামুদ সত্য কথার সম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন; দেখিলে ত, বৃদ্ধার উচিত কথায় কেমন সন্তুষ্ট হইলেন।

শুনা যায়, এক সময়ে মামুদ গজনীর পশ্চিম ভাগে ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সৈন্যেরা প্রজাদিগের শস্য কাটিয়া, গৃহ দগ্ধ করিয়া, পালিত পশু সকল বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতে লাগিল।

মামুদের একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। একদিন তিনি মামুদকে বলিলেন যে, “মহারাজ! আমি এক সময়ে এক পীরের উপর দয়া দেখাইয়াছিলাম; পীর সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একটী বিষয় শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি পাখীর কথা বুঝিতে পারি।” মামুদ শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন।

পরদিন মামুদ শিকারে চলিলেন, সঙ্গে সেই মন্ত্রীও ছিলেন। কিছুদূর গমন করিলে মামুদ দেখিলেন, একটী বৃক্ষে দুইটী পেচক বসিয়া যেন পরস্পর কি বলিতেছে। মামুদ তখন মন্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি যে কাল বলিয়াছিলে পাখীর কথা বুঝিতে পার, এখন বল দেখি, এই দুইটী পেচক পরস্পর কি বলিতেছে ?" তখন মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ ! সে কথা আপনার শুনিবার যোগ্য নহে।"

মামুদ মন্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই—তুমি নির্ভয়ে বল।" মন্ত্রী বলিলেন, "দেখুন মহারাজ ! এই দুইটী পাখীর মধ্যে একটীর এক পুত্র ও অপরটীর এক কন্যা আছে। যাহার কন্যা আছে, সে অপরটীকে বলিতেছে, "আমি তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছি ; কিন্তু জনশূন্য পঞ্চাশ খানি গ্রাম আমার কন্যাকে যৌতুক দিতে হইবে।' যাহার পুত্র, সে হাসিয়া বলিতেছে, "তাহাতে আর বাধা কি আছে ? আমাদের সুলতান মামুদ কিছুকাল জীবিত থাকিলে, তুমি যে যৌতুক চাহিতেছ, তাহার দশগুণ যৌতুক দিতে পারিব।"

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মামুদের জ্ঞান হইল, তিনি মন্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তদবধি মামুদ আর কোন গ্রাম ধ্বংস করেন নাই।

বিজয়সেন ও রাণাপ্রভাবতী।

আদিশূরের বংশে চন্দ্রসেন নামে একজন রাজা হন। চন্দ্র সেনের পুত্র ছিল না, একমাত্র কন্যা; কন্যার নাম প্রভাবতী। চন্দ্রসেন, বিজয়সেনের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ দিলেন। বিজয়সেনের সংসারে মন ছিল না; তিনি যপতপে অনেক সময় কাটাইতেন। চন্দ্রসেনের ইচ্ছা জামাতা রাজকার্য্য দেখেন; তিনি জামাতাকে ইহার জন্য অনেক বার অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। বিজয়সেন উত্তর করিলেন, "আমার সংসারে মন নাই, আমি সংসারের কোন কাজ কর্ম্ম দেখিতে পারিব না। আমি রাজারও পুত্র নহি; সুতরাং রাজকার্য্য না করিলে আমার কোন পাপ হইবে না। আপনার মৃত্যুর পর, আমি আপনার রাজ্যেরও কোন আশা রাখি না। আপনার দৌহিত্র হইলে, সেই রাজকার্য্য দেখিবে; তখন তাহাকে এই সকল উপদেশ দিবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার সংসারে মন নাই, কিন্তু তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, তোমার নিজের জন্য অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন; যদি তুমি কোন কর্ম্ম না করিয়া অন্যের নিকট হইতে এই সকল লও, তাহা হইলে তাহাও একরূপ চুরি করা হয়।" এই কথা শুনিয়া বিজয়সেন ক্রোধে বলিলেন, "আমি আজ হইতে আর অন্যের অন্ন গ্রহণ করিব না, অন্যের গৃহে বাস করিব না, অন্যের দেয় বস্ত্র পরিধান করিব না; এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীবেশে, গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলেন। শ্বশুর শাশুড়ী বিস্তর বলিলেন, কিন্তু বিজয়সেন

সে সকল কথা শুনিলেন না। প্রভাবতীও বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বিজয় প্রভাবতীকে বলিলেন, 'তুমি কোথায় যাইতেছ ?' প্রভাবতী উত্তর করিলেন, 'তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব।' বিজয় বলিলেন, "তুমি রাজার কন্যা, তুমি কি আমার সঙ্গে কষ্ট সহিতে পারিবে ?" প্রভাবতী উত্তর করিলেন, "স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা ; স্বামীর সেবা করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর সুখের বিষয় কি আছে ? তুমি এখানে ছিলে, সেজন্য তোমার সঙ্গে আমিও এখানে ছিলাম। এখন তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি। হয় আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে দাও, না হয় আমাকে মারিয়া ফেল। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবনা।" বিজয় প্রভাবতীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তোমার পিতা যে সকল অলঙ্কার তোমায় দিয়াছেন, সেগুলি খুলিয়া ফেল। প্রভাবতী শাঁখা ও খাড়ু রাখিয়া আর সকল গহনা খুলিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া বিজয় আনন্দে বলিলেন, "এখন জানিলাম, তুমি আমার সাধ্বী স্ত্রী ; তুমি আমার সঙ্গে চল।" প্রভাবতী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিজয় গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রভাবতীকে লইয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন বন হইতে ফল, মূল, কাষ্ঠ আনিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সংসার চলিত। অন্য সময়ে জপ তপ করিতেন। রাজা ও রাণী গোপনে প্রভাবতীকে সাহায্য করিতে চাহিলেন। প্রভাবতী বলিয়া পাঠাইলেন, 'একথা আমার স্বামী জানিতে পারিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। যদি

আপনাদের নিতান্ত সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার স্বামী যে সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যান, সেগুলি যদি অধিক মূল্যে আপনারা ক্রয় করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সাহায্য করা হইবে, অথচ আমার স্বামীও রুষ্ট হইবেন না।' রাজা ও রাণী প্রভাবতীর কথামত কার্য্য করিতে লাগিলেন।' ক্রমে বিজয়ের এক পুত্র হইল। তিনি পুত্রের নাম 'বল্লাল' রাখিলেন।

বল্লালের বয়স যখন চৌদ্দবৎসর তখন চন্দ্রসেনের কঠিন পীড়া হইল; তিনি বল্লাল ও প্রভাবতীকে দেখিতে চাহিলেন। বল্লাল ও প্রভাবতী বিজয়কে সেকথা জানাইলেন; বিজয় কোন বাধা দিলেন না। প্রভাবতী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ে গেলেন এবং পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেন। চন্দ্রসেন বলিলেন, "মা, তোমার কি দোষ যে আমি তোমায় ক্ষমা করিব? তুমি যে সকল সুখ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছ ইহা ত পরম সুখের কথা। তোমার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, এ আনন্দ রাখিবার আমার স্থান নাই। আর বিজয় যে তোমাদিগকে এখানে আসিতে দিয়াছে, ইহাতে যে আমার কত আনন্দ হইয়াছে. তাহা মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার মৃত্যু হইলে, বল্লালই রাজা হইবে।" ইহার কিছুদিন পরে চন্দ্রসেনের মৃত্যু হইল। বল্লাল গৌড়ের রাজা হইলেন। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া গঙ্গাতীরে বাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক সন্তানসন্ততি হইয়াছিল। বল্লাল তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের আচার,

বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান এই নয়গুণ আছে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে কুলীন উপাধি দিলেন; আর যাঁহাদের ছয়টী গুণ ছিল, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, আর সকলকে কষ্ট শ্রোত্রিয় এই উপাধি দিয়াছিলেন। বল্লাল কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রদিগকে কুলীন ও দত্তদিগকে মৌলিক উপাধি দেন।

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা।

অনঙ্গপাল নামে দিল্লীর এক সম্রাট ছিলেন। আজমীরের রাজা সোমেশ্বর তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হন। একটী মহাযুদ্ধে তিনি অনঙ্গপালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই উপকার স্মরণ করিয়া তিনি সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। সেই কন্যার গর্ভে সোমেশ্বরের এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ। অনঙ্গপালের আর একটী কন্যা ছিল; কান্যকুব্জের রাজা বিজয়পালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে জয়চাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ উভয়ে অনঙ্গপালের দৌহিত্র; উভয়েই মাতামহের সমান যত্নে, সমান স্নেহে ও সমান আদরে পালিত। কিন্তু জয়চাঁদের ভাগ্য পৃথ্বীরাজের ন্যায় সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই।

পৃথ্বীরাজের বয়স যখন আটবৎসর, সেই সময়ে অনঙ্গপালের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সম্রাট করিয়া যান। মাতামহের এই ব্যবহারে পৃথ্বীরাজের প্রতি

জয়চন্দ্রের ঈর্ষ্যা জন্মিল। তিনি পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন না। দেশে, দেশে, সর্ব্বত্র, সকলের সম্মুখে জয়চন্দ্র আপনাকেই সম্রাট বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। শেষে সম্রাট উপাধি লাভ করিবার জন্য একটী রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তিনি দেশ বিদেশের রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন,—সকল রাজাকেই সেই যজ্ঞে আসিতে হইবে এবং তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যজ্ঞ শেষ হইলে, জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা সেই রাজাদিগের মধ্যে যিনি মনোমত হইবেন, তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজকে জয়চন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র ক্রোধে পৃথ্বীরাজের এক বিশ্রী মূর্ত্তি গড়াইয়া দ্বারদেশে রাখিয়া দিলেন। যজ্ঞ শেষ হইলে সংযুক্তা পতিবরণ করিবার জন্য সভায় আসিলেন। তিনি অগ্রেই পৃথ্বীরাজের গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, সভায় আসিয়া আর কোন রাজার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। দ্বারদেশে পৃথ্বীরাজের যে বিশ্রী মূর্ত্তি ছিল, তাহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন।

পৃথ্বীরাজ এই সংবাদ পাইয়া কান্যকুব্জে গমন করিলেন এবং রাজকুমারী সংযুক্তাকে নিজের অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। জয়চন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন; কিরূপে এই অপমানের শোধ লইবেন, মনে মনে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, ইহার কিছুকাল পরে নাগরকোট নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে সাতকোটী স্বর্ণ-

মুদ্রা পাওয়া যায়। পৃথ্বীরাজ সেই সকল মুদ্রা লইতে চাহিলে, জয়চন্দ্র বাধা দিলেন। বালক বালিকাগণ! তোমরা গজনী ও পারস্য রাজ্যের নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছ; ঐ দুই রাজ্যের মধ্যে ঘোর নামে একটী রাজ্য ছিল। মহম্মদঘোরী সেখানকার একজন প্রবল রাজা ছিলেন। জয়চন্দ্র দেখিলেন, একাকী পৃথ্বীরাজকে বাধাদিলে কোন ফল হইবে না, তখন তিনি মহম্মদঘোরীকে দিল্লী জয়করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন, মহম্মদঘোরীও জয়চন্দ্রের পরামর্শে দিল্লী জয় করিবার জন্য অনেক সৈন্য লইয়া আসিলেন। চিতোরের রাজা সমরসিংহের সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার বিবাহ হইয়াছিল। সমরসিংহ একজন বীর ছিলেন; তিনি পৃথ্বীরাজের সহিত যোগ দিলেন। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ মহম্মদঘোরীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন; সেই যুদ্ধে তাঁহাদের জয় হইল। মহম্মদঘোরী অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন, নাগরকোটের সেই সাতকোটী স্বর্ণ মুদ্রা এখন পৃথ্বীরাজ লইলেন এবং সমরসিংহের পরামর্শে সেই সমস্ত মুদ্রা সৈন্যদিগকে পুরস্কার দিলেন।

দুই বৎসর পরে মহম্মদঘোরী পুনরায় অনেক সৈন্য লইয়া দিল্লীজয় করিতে আসিলেন। জয়চন্দ্র গোপনে মহম্মদঘোরীর সহিত যোগ দিলেন। থানেশ্বরের নিকট কাগ্গার নদীর তীরে নারায়ণ নামক স্থানে তিন দিন ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বালক বালিকাগণ, দেখিলে

জয়চন্দ্র কেমন গৃহশত্রু ছিলেন? কিন্তু তাঁহার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছিল; পর বৎসর মহম্মদঘোরী জয়চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করেন, সেইযুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

লক্ষ্মণসেন।

লক্ষ্মণসেন বল্লালসেনের পুত্র। তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন আশী বৎসর, সেই সময়ে সেখ জালালউদ্দীন নামক একজন মুসলমান ফকির একদিন গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সাধুর অসাধারণ গুণ দেখিয়া তাঁহার উপর লক্ষ্মণসেনের অত্যন্ত ভক্তি হয়। তিনি সেই সাধুর মুখে শুনিলেন, মুসলমানেরা শীঘ্রই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে। এই কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন তাঁহার সভায়, যত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও গণনা করিয়া বলিলেন, সাধুর কথা সত্য। তখন লক্ষ্মণসেন তাঁহার পুত্র মধুসেনকে রাজা করিয়া কয়েকজন পণ্ডিত ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণসেন সেইখানে দিবারাত্র জপ, তপ, পূজা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেন। তথায় তিনি একবৎসর দশমাস অবস্থান করিলে পর, মুসলমানেরা নবদ্বীপ আক্রমণ করে।

তোমরা মহম্মদঘোরীর নাম শুনিয়াছ; তাঁহার তখন মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিন সে সময় দিল্লীর সুলতান। তিনি বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে গৌড়রাজ্য জয় করিবার জন্য

পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, গৌড়রাজ্যের রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করেন। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ রাজধানী মনে করিয়া তাহাই আক্রমণ করিতে চলিলেন। ভাগিরথীর পশ্চিমপারে জঙ্গলে সমস্ত সেনা লুকাইয়া রাখিয়া তাজিমখাঁ নামক একব্যক্তির সহিত ১৭জন অশ্বারোহী সেনা পাঠাইয়া দিলেন। তাজিম প্রচার করিল, তাহাদের সহিত সেনাপতির বিবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য গৌড়ের রাজার নিকট চাকরীর প্রার্থনা করিতে যাইতেছে। সে বিনা বাধায় গঙ্গা পার হইল। রাজবাটীর ফটকে গিয়া দেখে অল্প কয়েকজনপ্রহরী রহিয়াছে; তাজিম হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল। বখ্‌তিয়ার সুযোগ বুঝিয়া সমস্ত সেনা লইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণসেনের যুদ্ধের কোন আয়োজন ছিল না, তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন্ করিলেন এবং নৌকাযোগে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দিন।

মহম্মদ ঘোরীর একজন ক্রীত দাস ছিলেন, তাঁহার নাম কুতুবুদ্দিন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে, কুতুব দিল্লীর রাজা হন। তিনি নিজে দাস ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার বংশের সকল রাজাদিগকে দাস রাজা বলে। কুতুবুদ্দিনের পর ছয়জন

রাজা হন। তৎপরে নাসিরুদ্দিন রাজা হইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দিন বৃহৎ রাজ্যের রাজা হইলেও, সামান্য লোকের মত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি রাজাদিগের মত উৎকৃষ্ট পোষাক পরিতেন না, উত্তম খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার মন অতি উচ্চ ছিল। প্রজাদিগের যে কার্য্য করিলে মঙ্গল হয়, সেই কার্য্য করিতেন। তাঁহার রাণীকে নিজ হস্তেই রন্ধন করিতে হইত, তিনি রন্ধন করিবার জন্য কোন পাচক নিযুক্ত করেন নাই। একদিন তাঁহার রাণী রন্ধনকালে হস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তিনি নাসিরুদ্দিনের নিকট আসিয়া বলিলেন, "রন্ধনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত কর।" নাসিরুদ্দিন বলিলেন, "আমি বৃহৎ রাজ্যের রাজা বটে, কিন্তু রাজ্যের অর্থ সব প্রজাদের। প্রজাদের যাহা করিলে মঙ্গল হয়, তাহার জন্য এই সকল অর্থ ব্যয় করা হইবে। আমি প্রজার অর্থ এরূপ করিয়া অপব্যয় করিতে পারিব না।" রাণী নাসিরুদ্দিনের এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। নাসিরুদ্দিন প্রজাদিগের এক কপর্দ্দকও অন্যায় ব্যয় করিতেন না। তিনি নিজ হস্তে পুস্তক লিখিতেন, সেইগুলি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা নিজব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তোমরা এমন ধার্ম্মিক রাজার নাম শুনিয়াছ কি ?

কৈকুবাদ।

দাসবংশের শেষ রাজার নাম কৈকুবাদ। তাঁহার পিতার নাম বুগ্‌রা খাঁ। বুগ্‌রা খাঁর মহম্মদ নামে এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার পিতা বল্‌বন যখন জীবিত ছিলেন, তখন মহম্মদের মৃত্যু হয়। মহম্মদের একমাত্র পুত্র ছিল, তাঁহার নাম কৈখসৃরু। বলবন্ মৃত্যু সময়ে তাহাকে রাজা করিয়া যান; কিন্তু মন্ত্রীরা কৈকুবাদকে রাজা করিয়া কৈখসরুকে গোপনে হত্যা করিল।

কৈকুবাদ যখন রাজা হন, তখন বেশ সৎ ছিলেন, সে সময়ে তাঁহার বয়সও অধিক হয় নাই, কিন্তু মন্দ মন্ত্রীদের সংসর্গে শেষে নিজেও মন্দ হইয়া পড়িলেন। পশুর মত তাঁহার স্বভাব হইয়া উঠিল। বুগ্‌রা খাঁ পুত্রের স্বভাব মন্দ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; একদিন পুত্রের নিকটে আসিলেন, তখন কৈকুবাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন; পিতা আসিয়া দুইবার প্রণাম করিলেন, তিনবার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে, কৈকুবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, পিতাপুত্রে মিলন হইল। বুগ্‌রা খাঁ কৈকুবাদকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, কৈকুবাদের মনও পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সৎ হইবেন বলিয়া পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু কুসংসর্গে কি মানুষের আর নিস্তার আছে? সৎ শিক্ষা পাইলে, মানুষ সৎ হয়, কিন্তু অসৎ সঙ্গে আর সে

শিক্ষার কোন ফল হয় না। বুগ্‌রা খাঁ যেমন দিল্লী হইতে চলিয়া গেলেন, অমনি কৈকুবাদের মন্ত্রীরা আসিয়া তাঁহাকে মন্দ পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল। কৈকুবাদ আবার মন্দ হইয়া পড়িলেম। শেষে জেলালুদ্দিন খিলিজী নামে একব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল।

মন্দ লোকের সঙ্গে থাকিলে কিরূপ মন্দ ফল হয় দেখিলে ত ? তোমরা কখন মন্দ লোকের সঙ্গে থাকিও না, তোমাদের স্বভাবও মন্দ হইয়া যাইবে। সকলে তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে; ভাল বাসিবে না।

পদ্মিনী।

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাজা ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে রাজা হন, সেই জন্য তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য দেখিতেন ; ভীমসিংহের স্ত্রীর নাম পদ্মিনী। লঙ্কাদ্বীপে এক রাজ বংশে পদ্মিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হামিরশঙ্কর। পদ্মিনীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ ছিল। তখন আলাউদ্দিন দীল্লির সম্রাট ছিলেন। তিনি পদ্মিনীর রূপের কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনেক সৈন্য লইয়া চিতোর জয় করিতে আসিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত চিতোর অবরোধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।শেষে প্রচার করিয়া দিলেন, "আমি পদ্মিনীকে পাই-লেই চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব ;" ভীমসিংহ তাহাতে

সম্মত হইলেন না। তৎপরে আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তিনি একবার মাত্র পদ্মিনীকে দেখিতে চাহেন।" ভীমসিংহ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। শেষে স্থির হইল, পদ্মিনী একখানি বৃহৎ দর্পণের নিকটে দাঁড়াইবেন; সেই দর্পণে তাঁহার যে প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহাই আলাউদ্দিন দেখিবেন। আলাউদ্দিন কয়েক জন সঙ্গী লইয়া চিতোরের রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন, তিনি দর্পণে পদ্মিনীর রূপ লাবণ্য দেখিয়া, তাঁহাকে যে কোন উপায়ে লাভ করিবেন, স্থির করিলেন। তিনি কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং পদ্মিনীকে পাইলেই মুক্তি দিবেন, এইকথা প্রচার করিয়া দিলেন।

ক্রমে পদ্মিনী এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি গোরা ও বাদল নামে দুই জন আত্মীয়কে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া সমস্ত স্থির করিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। দূত গিয়া বলিল, "পদ্মিনী রাজকন্যা, ও রাজরাণী, তিনি সেইরূপ ভাবেই আপনার নিকটে আসিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহার সঙ্গিনীগণ সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন, আর যে সকল রাজপুতনারী তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চিরদিনের মত বিদায় লইবার জন্য তাঁহার সহিত আসিবেন। বিদায় লইবার পর, তাঁহারা সকলে চিতোরে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের যেন কোন রূপ সম্মানের ত্রুটি না হয়, কেহ যেন তাঁহাদের নিকটে আসিয়া মান হানি না করে, ইঁহাতে যদি আপনি সম্মত হন

এবং আপনার সৈন্য সকল লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে, যে দিন আপনি স্থির করিয়া দিবেন, সেইদিন পদ্মিনী আপনার নিকট আসিতে সম্মত আছেন।" এই কথা শুনিয়া আলাউদ্দিনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি দিন স্থির করিয়া বলিয়া দিলেন। সেই দিন প্রায় সাত শত শিবিকা চিতোর হইতে আলাউদ্দিনের শিবিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেক শিবিকা ছয়জন যোদ্ধা বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং প্রত্যেক শিবিকার মধ্যে কয়েক জন যোদ্ধা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া লুক্কায়িত ছিল। আলাউদ্দিন তাহা জানিতে পারেন নাই; তিনি ভীমসিংহকে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য পদ্মিনীর সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিলেন। ভীম সিংহ শিবিকার নিকট আসিলে, তাঁহার কয়েকজন সেনানী তাঁহাকে শিবিকার মধ্যে গোপনে তুলিয়া লইয়া চিতোরের দিকে গমন করিল। আরও কতকগুলি শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আলাউদ্দিন মনে করিলেন, পদ্মিনীর সঙ্গিনীগণ তাঁহার নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইয়া চিতোরে ফিরিয়া যাইতেছেন।

ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। ভীমসিংহ ফিরিয়া আসিলেন না; তখন আলাউদ্দিনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি শিবিকার নিকটে গেলেন; দেখিলেন, ভীমসিংহ ও নাই, পদ্মিনী ও নাই। কেবল দলে দলে যোদ্ধা সকল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া শিবিকা হইতে বাহির হইতেছে। সেইখানে হিন্দু ও মুসলমানে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। ভীমসিংহকে লইয়া যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য আলাউদ্দিন একদল সেনা পাঠাইলেন।

পথে তাহাদিগের সহিত রাজপুতদিগের ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। ভীমসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া শীঘ্র চিতোরের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীর বালক বাদল ও গোরার রণকৌশলে এই যুদ্ধে রাজপুতদিগের জয় হইল। বীরবালক বাদলের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ মাত্র। মহাবীর গোরা এই যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আলাউদ্দিন দুঃখে ও লজ্জায় সৈন্য লইয়া দীল্লিতে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলাউদ্দিন পুনরায় চিতোর জয় করিতে আসিলেন। আবার হিন্দু মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ বাধিল ; অনেক রাজপুতবীর এযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। শুনা যায়, একদিন রাত্রি দুইপ্রহরের সময় রাণা লক্ষ্মণসিংহ নির্জ্জনে বসিয়া যুদ্ধের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিয়া উঠিল "মেইভুখাহু।" রাণা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছেন। তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা ! এখনও কি তোমার পিপাসার শান্তি হয় নাই। আমার বংশের অষ্ট সহস্র বীর পুরুষ এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; তাঁহাদের রক্ত পান করিয়াও কি তোমার পিপাসার শান্তি হইল না ?" দেবী বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত না তোমার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে, সে পর্য্যন্ত আমার পিপাসার শান্তি হইবে না।

প্রাতে রাণা মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন। মন্ত্রীরা মনে করিলেন রাজা পাগল হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে সে দিন রাত্রে রাজার নিকটে রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে দেবী পুনরায়

আসিয়া কহিলেন, "এক এক জন রাজকুমার সিংহাসনে বসিবেন, আর তিন দিন রাজত্ব করিবার পর, চতুর্থ দিনে তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ দ্বাদশ রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করিলে, রাজপুতদিগের জয় হইবে।

দেবীর আদেশে এক এক জন রাজ পুত্র সিংহাসনে বসিতে লাগিলেন, এবং তিনদিন রাজত্ব করিবার পর, চতুর্থ দিনে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। শেষে মাত্র রাণা লক্ষ্মণ সিংহ আর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহ জীবিত রহিলেন। তখন তিনি রাজপুত নারীদিগের জাতিকুল রক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল। পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত নারীগণ সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, অজয়সিংহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন, আলাউদ্দিন চিতোর জয় করিলেন।

গিয়াসুদ্দীন।

মহম্মদ টোগলক নামে দিল্লীর একজন রাজা হন। তাঁহার সময়ে সামসুদ্দিন বাঙ্গলার স্বাধীন রাজা হন। তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দীন; তাঁহার মত মুসলমান রাজা অতিঅল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গিয়াসুদ্দীন একদিন তীরনিক্ষেপ করিবার সময়ে হঠাৎ এক দুঃখিনী বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রকে শরবিদ্ধ করেন। তাহাতে বৃদ্ধার পুত্রের মৃত্যু হয়; সে সুলতানের নামে কাজির নিকট

অভিযোগ করিল। কাজি ন্যায় বিচারক ছিলেন; রাজা অপরাধ করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও তিনি ন্যায় বিচার করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। হঠাৎ নরহত্যার জন্য তখন যে অর্থ দণ্ড হইত, রাজাকে তাহা দিতে বলিলেন। রাজাও কোন কথা না বলিয়া সেই অর্থ দিলেন।

বিচারালয় হইতে চলিয়া আসিবার সময়ে, রাজা কাজিকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই তরবারি দেখিতেছেন, মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আজ যদি রাজা বলিয়া আমাকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে এই তরবারি দ্বারা আপনার মস্তক ছেদন করিব।"

এই কথা শুনিয়া কাজিও আপনার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে একগাছা বেত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "আপনি এই বেত্র দেখিতেছেন, আমিও মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, আপনি যদি আমার আজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে এই বেত্র প্রহারে আপনার পৃষ্ঠের চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিব। অদ্য আমাদের উভয়েরই এক বিষম পরীক্ষা হইয়া গেল, এবং ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদের উভয়কেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন।

আহম্মদ সা।

মামুদ টোগলক যখন দিল্লীর রাজা ছিলেন, তখন জাফর খাঁ নামে একজন গুজরাটে স্বাধীন রাজা হন। আহম্মদ সা জাফর খাঁর পৌত্র। তিনি গিয়াসুদ্দিনের ন্যায় একজন ধার্ম্মিক রাজা

ছিলেন। শুনা যায়, একদিন তাঁহার জামাতা একটি লোককে হত্যা করেন। কাজি বিচার করিয়া তাঁহার সামান্য অর্থ দণ্ড করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাজার জামাতার উপর এরূপ অনুগ্রহ দেখাইলে, রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু তাঁহার বিষম ভুল হইয়াছিল। কারণ যখন আম্মদ সা এই ঘটনা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং কাজিকে পুনরায় বিচার করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। এবার কাজি ন্যায়বিচার করিয়া রাজার জামাতার ফাঁসীর আদেশ দিলেন। তৎপর আহম্মদসার ইচ্ছায় আহম্মদাবাদের বাজারে সকলের সম্মুখে কাজির আদেশমত কার্য্য হইল। লোকে জানিতে পারিল, রাজার নিয়ম সকলের পক্ষেই সমান; তাহা না মানিয়া চলিলে, রাজার জামাতাও অব্যাহিত পাইতে পারেন না।

গুরু নানক।

নানক শিখদিগের আদি গুরু। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। 'শিষ্য' এই কথাটী হইতে 'শিখ' এই নাম হইয়াছে; নানকের শিষ্যদিগকে সকলে শিখ বলে।

লাহোরের নিকট কাণাকুচা গ্রামে নানকের জন্ম হয়। নানকের পিতার নাম কালুবেদী। তাঁহার এক ভগ্নী ছিলেন, তাঁহার নাম নানছি। ইব্রাহিম লোদী তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। দৌলৎখাঁ লোদী নামে তাঁহার একজন আত্মীয় ছিল; তাঁহার

একজন কর্ম্মচারী জয়রামের সহিত নানছির বিবাহ হয়। নানক বাল্যকাল হইতেই অতিশয় দয়ালু ও সচ্চরিত্র ছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি পিতার আদেশে পশু চরাইতেন। ফকির সন্ন্যাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন। সঙ্গে যাহা কিছু থাকিত, তাঁহাদিগকে তাহাই দান করিতেন। পুত্রের সংসারে মন নাই দেখিয়া কালু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি জামাতার নিকট পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। জয়রাম তখন দৌলতখাঁর অধীনে সুলতানপুর নামক স্থানে এক শস্যালয়ে কার্য্য করিতেন। নানক জয়রামের কথামত কার্য্য করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার কোমল ও সদয় ব্যবহারে তিনি সকলেরই পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন।

কিছুদিন পরে হঠাৎ এক সন্ন্যাসী আসিয়া নানকের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নানক, তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তুমি এ ব্যবসায় ত্যাগ কর। এ সামান্য কার্য্যে বদ্ধ থাকা তোমার উচিত নহে।" সেই কথায় তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনি শস্যালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং সমুদায় সামগ্রী দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সুলতানপুর হইতে চলিয়া গেলেন।

দৌলত খাঁ এই সংবাদ পাইয়া জয়রামকে বন্দী করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, নানক সন্ন্যাসীর বেশে দৌলত খাঁ লোদীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আপনি জয়রামকে বন্দী করিলেন কেন? হিসাব দেখুন, যদি জয়রামের নিকট আপনার কিছু পাওনা থাকে, তাহা হইলে আপনি

আমাকে যে দণ্ড দিবেন, আমি তাহাই বহন করিব।” দৌলত খাঁ তখন হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জয়রামের নিকট তাঁহার কিছু পাওনা নাই বরং তাঁহার নিকট জয় রামের প্রায় সহস্র মুদ্রা পাওনা রহিয়াছে। দৌলত খাঁ এই টাকা দিতে চাহিলেন, নানক গ্রহণ করিলেন না; “আপনি এই টাকা গরিব দুঃখীদিগকে দান করুন,” এই কথা বলিয়া নানক চলিয়া গেলেন।

তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কালুবেদী সুলক্ষণা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। ইহাঁর গর্ভে নানকের দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মীদাস। নানক বেদ, কোরাণ সমস্ত পড়িয়া ফেলিলেন; সন্ন্যাসী হইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করিলেন, তিনি মক্কায় যাইয়া ফকিরদিগের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া আসিলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার শিষ্য হইল। যাহাতে দেশের লোকে পরস্পর বন্ধুভাবে মিলিত হয়, ধর্ম্মপথে চলে, তাহাদের প্রবৃত্তি সৎ হয়, তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানকের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। তিনি আপনাকে “ঈশ্বরের একজন ভৃত্য ও বিনীত আজ্ঞাবাহক” বলিতেন। নানক শিষ্যদিগকে বলিতেন, “ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না।” ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর, তাঁহার মৃত দেহ

লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। হিন্দুরা তাঁহার দেহ দাহ করিতে চাহিলেন। মুসলমানেরা সমাধিস্থ করিতে চাহিল। ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর, তাহারা আস্তরণ খুলিয়া দেখে তাঁহার মৃতদেহ নাই। তৎপরে শিষ্যগণ সেই আস্তরণ ছিন্ন করিয়া দুইখণ্ড করিল। হিন্দুরা একখণ্ড লইয়া দাহ করিলেন। মুসলমানেরা অপর খণ্ড লইয়া সমাধিস্থ করিল।

শ্রীচৈতন্য।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী, স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁহার বাল্যকালের নাম বিশ্বম্ভর ও নিমাই। ২৪ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান।

চৈতন্যদেব একবার পুরী যাইতেছেন, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছেন, পথে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হইল; বৈষ্ণবের সমস্ত শরীরে কুষ্ঠ রোগ, ক্ষতস্থান দিয়া পোকা পড়িতেছে, বৈষ্ণব যত্ন করিয়া ক্ষতস্থানে পোকাগুলি তুলিয়া দিতেছেন, আর ধীরে ধীরে চলিতেছেন। চৈতন্যদেব মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এ ত একজন সাধু বৈষ্ণব দেখিতেছি। পোকাগুলির আহার উহার ক্ষতস্থানে রহিয়াছে বলিয়া পোকা গুলিকে যত্ন করিয়া সেই স্থানে তুলিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবের

জীবের প্রতি এত দয়া! জীবকে এত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে ?” যিনি জীবের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, সেই চৈতন্যদেব কি এরূপ দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন! তিনি ছুটিয়া গিয়া বৈষ্ণবকে আলিঙ্গন করিলেন।

তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে, যেমন চৈতন্যদেব বৈষ্ণবকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তাহার সমস্ত কুষ্ঠরোগ দূর হইল; সে দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, “ঠাকুর! এ আবার কি করিলে? এই সুশ্রী শরীর দেখিয়া আবার যে আমার মনে অহঙ্কার আসিবে, আমার কুষ্ঠ রোগ যে ভাল ছিল।”

পৃথিবীতে সাধু লোকের কেমন আদর হয়, দেখিতে পাইলে? বৈষ্ণবকে সাধু জানিতে পারিয়া চৈতন্যদেব ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার সমস্ত গাত্রে কুষ্ঠ রোগ রহিয়াছে, তাহা একবার ভাবিলেন না। তোমরা সকল জীব জন্তুর প্রতি দয়া করিতে শিখিবে। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিতে শিখিবে, দয়ার তুল্য পৃথিবীতে আর কোন গুণ নাই।

এক দিন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া আছেন, মন্দিরে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। যাহারা অত্যন্ত বলবান তাহারাই কেবল জনতা ভেদ করিয়া ঠাকুর দেখিতে পারিতেছে। এক বৃদ্ধা ঠাকুর দেখিবার জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একমনে ঠাকুর দেখিতে লাগিল। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণ অত্যন্ত

বিরক্ত হইলেন, তাঁহারা বৃদ্ধাকে নামাইয়া দিতে গেলেন। চৈতন্যদেব বাধা দিয়া বলিলেন, "হায়! কবে আমার ঠাকুর দর্শন করিতে এই বৃদ্ধার ন্যায় আগ্রহ জন্মিবে? যে দিন আমার এইরূপ আগ্রহ জন্মিবে, সে দিন আমার জন্ম সার্থক। এই কথায় তাঁহার শিষ্যগণের জ্ঞান লাভ হইল। তখন তাঁহারা বৃদ্ধাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বালক বালিকাগণ! দেখিলে চৈতন্যদেব একে ব্রাহ্মণের পুত্র, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী; আর ঐ বৃদ্ধা অতি সামান্য স্ত্রীলোক! কিন্তু তাহার ভক্তি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন! ঐ স্ত্রীলোককে নিজস্কন্ধে স্থান দিয়াও তাহার ঠাকুর দেখিবার সুবিধা করিয়া দিলেন।

চৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন হোসেন সা গৌড়ের বাদশা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত লোক হইলেও চৈতন্যদেবের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। রূপ ও সনাতন নামে তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন।

হুমায়ুন ও হামিদাবেগম।

মুসলমানদিগের মধ্যে মোগল ও পাঠান জাতি ভারত শাসন করিয়াছিলেন। বালক বালিকাগণ! তোমরা পূর্ব্বে যে সকল মুসলমান সম্রাটের বিষয় পড়িয়াছ, তাঁহারা সকলে পাঠান ছিলেন। বাবর ভারতের প্রথম মোগলসম্রাট; হুমায়ুন

হুমায়ুন। বাবর

তাঁহার পুত্র। হুমায়ুনের আরও কয়েক ভ্রাতা ছিলেন; তিনি সম্রাট হইলে, তাহাদের অত্যন্ত ঈর্ষ্যা হইল। তাহারা তাঁহার সিংহাসন বলপূর্ব্বক লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেরসা নামে একজন পাঠান বীর প্রবল হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে হুমায়ুনের বিশেষ সুবিধা হইল না। তাঁহার সহিত সেরসাহের এক তুমুল যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। সেরসাহ দীল্লির সম্রাট হইলেন। তাঁহার একদল সেনা হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিল। হুমায়ুনের কষ্টের অবধি রহিল না; তিনি নিরাশ্রয়

নিঃসহায় অবস্থায় আগরা হইতে লাহোরে গেলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। তিনি অনেকগুলি হিন্দুরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে মালদেব নামে একজন হিন্দুরাজা তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি ছলে তাঁহাকে বন্দী করিবেন বুঝিতে পারিয়া হুমায়ুন শেষে অমরকোটে পলায়ন করিবেন স্থির করিলেন। পথে ভয়ানক মরুভূমির মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। মরুভূমির চারিদিকে কেবল বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে, বৃক্ষলতা কিছুই নাই, শীতল ছায়ায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করিবেন তাহারও কোন উপায় নাই। তাঁহার সঙ্গে যে সকল বেগম ছিলেন, তাঁহারা ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন, অতি কষ্টে তিনি মরুভূমি পার হইলেন। হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁহার প্রধান বেগম হামিদাও ছিলেন, তিনি তখন গর্ভবতী।

এক প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়, হামিদা বেগমের প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। একটি বৃক্ষের তলায় তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইনিই পরে আকবর সা হইয়াছিলেন। হুমায়ুনের তখন বড়ই দুর্দ্দশা; এরূপ আনন্দের সময় তিনি সঙ্গীদিগকে যে পুরস্কার দেন, এরূপ তাঁহার কিছুই ছিল না; হুমায়ুন ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকট একটু মৃগনাভী আছে; তিনি সেই মৃগনাভী টুকু একটী কাচপাত্রে রাখিয়া সঙ্গীদিগের সম্মুখে ধরিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “এই মৃগনাভীর সুগন্ধ যেমন চতুর্দ্দিক

আমোদিত করিয়াছে, আমার পুত্রের যশও যেন সমস্ত জগতে সেইরূপ ব্যাপ্ত হয়।" ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এই শিশুই পরে ভুবন বিখ্যাত সম্রাট্ আকবর নাম ধারণ করেন।

হুমায়ুন দেখিলেন, অমরকোটও তাঁহার পক্ষে নিরাপদস্থান নহে; তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া পারস্য রাজের আশ্রয় লইলেন। সেরসাহ চারিবৎসর মাত্র দিল্লির সম্রাট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আট বৎসরের মধ্যে ছয় জন পাঠান দীল্লির সম্রাট্ হন। হুমায়ুন পারস্যে থাকিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে যখন পাঠানদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি পারস্যরাজের নিকট হইতে অনেক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। শেষ পাঠান সম্রাট্ সেকন্দরসার সহিত পাণিপথ নামক স্থানে হুমায়ুনের ভয়ানক যুদ্ধ হয়. সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেন। আকবরের বয়স তখন দ্বাদশবর্ষ। তিনি এই যুদ্ধে অতিশয় বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

সের সা।

সের সা পাঠান ছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় রাজা হন। বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে তাঁহার মত প্রসিদ্ধ রাজা অতি অল্পই ছিলেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের গুণে এরূপ উন্নতি লাভ

করেন। বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ আফগানিস্থান হইতে দিল্লীতে সৈনিকের কার্য্য করিতে আসেন। তাঁহার পিতা দিল্লীর বাদশাঁহের অধীনে একটী চাকুরী গ্রহণ করেন ও বিহার অঞ্চলে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ পিতার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন।

সের সা।

পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দিল্লী যাইয়া বাদসাহের একজন কর্ম্মচারীর অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন। তাঁহার প্রভুর অনেক ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সাহায্যে তিনি বাদসাহের নিকট হইতে বিহারে এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। বাদসাহকে যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

পূর্ব্বে সের সাহের নাম ফ়রিদ ছিল। তিনি এরূপ বলবান্ ও সাহসী ছিলেন যে, একাকী একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করেন। পারস্য ভাষায় 'সের' কথার অর্থ 'ব্যাঘ্র', ইহা হইতেই তাঁহার নাম সের সাহ হয়। পূর্ব্বে তিনি দিল্লীর বাদসাহের অধীনে সৈনিকের কার্য্য করিয়াছিলেন। জায়গীর প্রাপ্তির পর, তিনি একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করেন। ক্রমে তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি প্রথমে বিহার ও পরে সমস্ত বাঙ্গলার রাজা হন। কালে তিনি দিল্লীর বাদসাহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন ও সম্রাট্ হন।

তখন বাঙ্গালা হইতে সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়া পড়িল।

তিনি তাঁহার রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ রাজপথ প্রস্তুত করান; এই রাজপথ প্রায় দুই সহস্র মাইল দীর্ঘ। তিনি পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পথিকদিগের জন্য মধ্যে মধ্যে সরাই নির্ম্মাণ করেন এবং এক ক্রোশ অন্তর এক একটি করিয়া কূপ খনন করাইয়া দেন। তাঁহার এমন শাসন ছিল যে, তাঁহার রাজত্বকালে দস্যু তস্করের ভয় একবারেই ছিল না। চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্য তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ঘোড়ার ডাক বসাইয়াছিলেন। বিহারে সাসেরাস নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেখানে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি রহিয়াছে।

সের খাঁর অত্যন্ত সহ্য গুণ ছিল। কালিঞ্জরের দুর্গ জয় করিবার সময়, একটী গোলা আসিয়া তাঁহার বারুদের গুদামে পড়ে। বারুদের গুদামে আগুন লাগায়, তাঁহার সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিলেন, কিন্তু মুখে কোনরূপ যন্ত্রণার ভাব দেখান নাই; কারণ, সেই ঘোরতর যুদ্ধের সময় তাঁহাকে কাতর দেখিলে, সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িবে। কালিঞ্জরের দুর্গজয় পর্য্যন্ত তিনি অটলভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই দুর্গজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

আকবর ও রঘুপতিসিংহ।

ভারতবর্ষে রাজপুতানা নামে এক বৃহৎ রাজ্য আছে। উদয়-পুর উহার মধ্যে একটি দেশ। সেখানকার রাজা প্রতাপসিংহের সহিত আকবরের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আকবর জয়লাভ করেন; কিন্তু প্রতাপ তাঁহার বশে আসিলেন না। তিনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। আকবরের সৈন্যগণও তাঁহাকে ধরিবার জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া প্রতাপ তাহা-দের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া অন্য বনে চলিয়া যাইতেন। প্রতাপের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কতকগুলি রাজপুত যুবক প্রতাপকে সাহায্য করিবার জন্য দল বাঁধিল। এই যুবক দলের যিনি প্রধান ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুপতিসিংহ। রঘুপতিসিংহও নিজের দল লইয়া প্রতাপের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন। একদিন শুনিতে পাইলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র ভয়ানক পীড়িত। সেই

আকবর।

সংবাদ পাইয়া রঘুপতিসিংহ দেশে গমন করিলেন। গৃহের নিকটে গিয়া দেখিলেন, মোগল সৈন্য তাঁহার গৃহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন, "আমি রঘুপতি-সিংহ।" প্রহরী বলিল, "তুমি সম্রাটের আদেশে বন্দী হইলে।" রঘুপতি বলিলেন, "গৃহে আমার একমাত্র পুত্র পীড়িত, একবারমাত্র তাহাকে দেখিবার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার হস্তে বন্দী হইব।" প্রহরী দয়া করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। রঘুপতি-সিংহ গৃহে গিয়া দেখিলেন, পুত্র ভয়ানক পীড়িত, জীবনের আশা নাই; তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিলেন, সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া প্রহরীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তুমি এখন আমায় বন্দী কর।" প্রহরী রঘুপতিসিংহের এই সত্যরক্ষার জন্য এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে বলিল।

রঘুপতিসিংহকে সহিত প্রহরী যখন এই কথা বলিতেছিল, তখন হঠাৎ একজন মোগল সেনাপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রঘুপতিকে বন্দী করিলেন। তৎপরে প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা পালন না করার জন্য তোমাকেও বন্দী করিলাম। কাল সম্রাটের নিকট তোমাদের দুইজনের বিচার হইবে।" পরদিন আকবরের নিকট দুইজনকে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া রঘুপতিকে বলিলেন, "বীর!

তুমি সত্যরক্ষা করিয়াছ; তোমার অমূল্য জীবন ঘাতকের হস্তে নষ্ট হইতে পারে না; তোমায় আমি ছাড়িয়া দিলাম। তুমি যাও, প্রতাপের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া আমার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিও। আমি তোমার জীবন নষ্ট করিব না।” তৎপরে প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য পালন কর নাই, তজ্জন্য তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত; কিন্তু তুমি সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছ, রঘুপতি সত্যরক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তুমি নিজের বিপদের দিকে না চাহিয়াও, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেছিলে, সেই জন্য আমি তোমারও প্রাণ রক্ষা করিলাম। যাও, পুনরায় তুমি গিয়া তোমার নিজের কার্য্য কর।”

বালকগণ! সত্যরক্ষার সম্মান ও পুরস্কার দেখিতে পাইলে? রঘুপতিসিংহ সত্যপালন করিয়াছিলেন বলিয়া, আকবর তাঁহার প্রাণবধ করিলেন না, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তোমরাও বাল্যকাল হইতে সত্যরক্ষা করিতে ও সত্যের প্রতি সম্মান দেখাইতে শিখিবে।

নূরজাহান।

নূরজাহানের বাল্যকালের নাম মিহিরউন্নিসা। তাঁহার পিতার নাম মির্জ্জাগিয়াস। তিনি পারস্য দেশের লোক ছিলেন; তাঁহার অবস্থা মন্দ হওয়ায় পরিবার লইয়া নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন

গর্ভবতী। একটী মরুভূমি পার হইবার সময়, তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয় এবং সেই মরুভূমির মধ্যেই মিহিরউন্নিসাকে প্রসব করেন। এই নবজাত কন্যাকে পাথেয় দিয়া লইয়া যান, গিয়াসের এরূপ সঙ্গতি ছিল না। তিনি কন্যাটিকে পথিমধ্যে ফেলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন বণিক ছিলেন, তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল; তিনি বালিকার ভরণপোষণের ভার লইলেন, এবং গিয়াসের স্ত্রীকে কন্যার লালনপালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ঐ বণিককে আকবর অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি দিল্লীতে আসিয়া আকবরের সহিত গিয়াসের পরিচয় করিয়া দেন এবং তাঁহাকে তাঁহার কন্যা প্রত্যর্পণ করেন। আকবরের দয়ায় গিয়াস রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই নিজের উন্নতি সাধন করিলেন।

নূরজাহান।

মিহিরউন্নিসা দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী ছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত মিহিরউন্নিসার বিবাহ হইল। তখন তাঁহার নূরজাহান অর্থাৎ 'জগতের আলোক' এই নাম হইল। জাহাঙ্গীর তাঁহার আর সকল স্ত্রী অপেক্ষা নূরজাহানকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার সহিত পরামর্শ

করিয়া অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহাকে এতদূর ভাল-বাসিতেন যে, টাকায় তাঁহার নামের সঙ্গে নূরজাহানের নামও মুদ্রিত হইত।

সাজাহান ও এব্রাহিম খাঁ।

সাজাহান ও শাহারিয়র উভয়েই সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র। জাহাঙ্গীর শাহরিয়রকে অধিক ভাল বাসিতেন; সাজাহানের তাহা সহ্য হইত না। তিনি মনে করিতেন, মৃত্যু সময়ে পিতা শাহরিয়রকে রাজ্য দিয়া যাইবেন; এইজন্য তিনি পিতার সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় আসিলেন এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা জয় করিলেন। সাজাহান বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিমকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি যদি আমার সহিত যোগ দাও ও আমার আজ্ঞা পালন কর, আমাকে রাজা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব থাকিবে।" এব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন, "যুবরাজ, আপনি সম্রাট্-পুত্র, আমার ভক্তির পাত্র, কিন্তু আপনি পিতার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; আমি

সাজাহান।

তাঁহার অন্নে পালিত, তাঁহার ভৃত্য ; সুতরাং তাঁহার যাহাতে অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য করিতে পারিব না। যদি ইহার জন্য আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, এবং সেই যুদ্ধে আমার প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি ; আমি আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিব। ইব্রাহিমের এই কথা শুনিয়া সাজাহান বিরক্ত হইলেন, তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন, সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম হত হইলেন।

জাহাঙ্গীর।

সাজাহান তখন দরাব খাঁ নামক একজনকে বাঙ্গালার নবাব করিবেন মনে করিলেন। দরাব খাঁ ও তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীরের অন্নে পালিত। কিন্তু দরাব খাঁ মনে করিলেন, সাজাহান

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা জয় করিয়াছেন, ইনিই পরে সম্রাট্ হইবেন; তিনি সাজাহানের কথায় সম্মত হইলেন। জাহাঙ্গীর সাজাহানকে শাস্তি দিবার জন্য অনেক সৈন্য সঙ্গে দিয়া পরবেশ নামে আর এক পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, সাজাহান পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালার দিকে পলায়ন করিলেন এবং দরাব খাঁর নিকট সাহায্য চাহিলেন। দরাব খাঁ মনে করিলেন, এখন সাজাহানকে আশ্রয় দিলে, মহা বিপদে পড়িতে হইবে; তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সাজাহান দরাব খাঁকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেন।

পরে পরবেশ যখন বাঙ্গালায় আসিলেন, তখন দরাব খাঁ তাঁহার নিকট গিয়া রাজভক্তি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "যুবরাজ, আমি সম্রাটের অন্নে পালিত ও তাঁহার আশ্রিত; সাজাহান সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এজন্য আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিই নাই।" পরবেশ অত্যন্ত দয়ালু লোক ছিলেন; তিনি দরাব খাঁর মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইলেন, এবং সম্রাটের নিকট পত্র লিখিলেন। জাহাঙ্গীর উত্তর দিলেন, "দরাব খাঁ কিছুতেই ক্ষমার পাত্র নহে। সে ও তাহার পিতা আমার অন্নে পালিত হইয়াছে, কিন্তু সে সাজাহানের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এ যুদ্ধে যদি সাজাহান জয়ী হইত, তাহা হইলে দরাব খাঁ তাহার সহিত যোগ দিয়া আমার যাহাতে অনিষ্ট হয়, এরূপ কর্ম্ম করিত; আমি উহার ছিন্নমুণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করি।"

বালক বালিকাগণ! তোমরা দেখিলে, ইব্রাহিম খাঁ কিরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, আর দরাব খাঁ কিরূপ কৃতঘ্ন। কৃতঘ্ন লোকের কখন ভাল হয় না, সে সকলের নিকট ঘৃণার পাত্র হয়। এই সাজাহান পরে দিল্লীর সম্রাট্ হন এবং অনেক হিতকার্য্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে পিতার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেন, কিছুতেই সে পাপের মোচন হয়
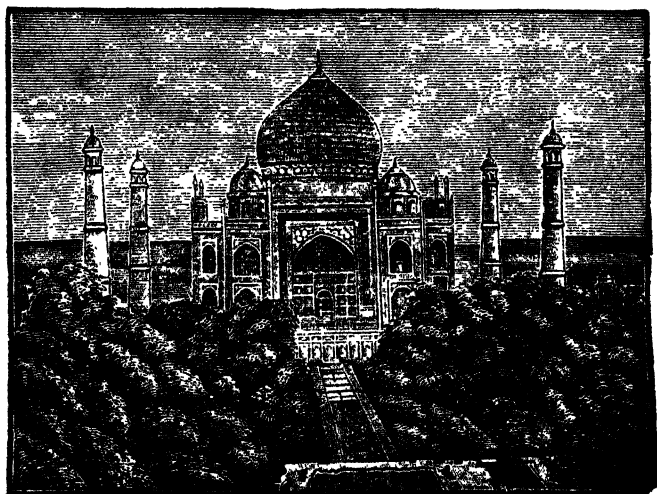
তাজমহল।

নাই। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে তৎপুত্র আরঙ্গেব তাঁহাকে বন্দী করেন। সেই অবস্থায় তিনি ২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তোমরা আগ্রার তাজমহলের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ, সম্রাট্ সাজাঁহান তাঁহার পত্নী মমতাজমহলের সমাধির উপর ঐ ভুবন-বিখ্যাত সৌধ নির্ম্মাণ করেন।

শিবাজী।

রাজপুত জাতির ন্যায় মহারাষ্ট্র জাতিও অত্যন্ত যোদ্ধা। শিবাজী মার্হাট্টা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাহজী; মাতার নাম জিজিবাই। শিবাজী অতি চতুর লোক ছিলেন, তিনি ক্রমে স্বাধীন রাজা হন। আরঙ্গেব তখন

আরঙ্গজেব।

মোগল বাদসা। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ আরঙ্গেবের সহিত সদ্ভাব করিবার জন্য শিবাজীকে পরামর্শ দেন, শিবাজী তাহাতে সম্মত হন। আরঙ্গেব শিবাজীর উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন,

এইরূপ ভান করিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শিবাজী, পুত্র শম্ভুজীকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। আরঙ্গেব তখন কৌশল করিয়া তাঁহাকে বন্দী

শিবাজী।

করেন। শিবাজী বাদসার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে পীড়ার ভান করিলেন। পরে তিনি আরোগ্য হইয়াছেন, এই কথা প্রচার করিয়া মিস্টান্ন দান করিতে লাগিলেন। ভারে ভারে

মিষ্টান্ন বাহিরে পাঠান হইল। শিবাজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী এই মিষ্টান্নের চুবড়ির মধ্যে বসিয়া গোপনে পলায়ন করিলেন। তিনি মথুরাতে শম্ভুজীকে রাখিয়া নিজে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া প্রয়াগ, কাশী, গয়া, কটক ও হাইদরাবাদ হইয়া রাইগড়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলে, শিবাজী কেমন চতুর লোক ছিলেন।

শিবাজী বন্দীর প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাইতেন। তিনি এক সময়ে বিজাপুরের সুলতানের সহিত যুদ্ধ করেন। কল্যাণতুর্গ জয় করিবার পর শিবাজীর সৈন্যাধ্যক্ষ আবাজী, কল্যাণের শাসনকর্ত্তা মৌলানা আহমদের পুত্রবধূকে বন্দী করেন। সেনাপতি স্বর্ণদেব তাঁহাকে শিবাজীর নিকট লইয়া গেলেন। ঐ স্ত্রীলোক পরমা সুন্দরা ছিলেন; সুন্দরী ভয়ে জড়সড় হইয়া শিবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক বালিকাগণ! শিবাজী সেই সুন্দরীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন শুনিবে? তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, "মা, তোমার কোন ভয় নাই, আমি শীঘ্রই তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিব; কিন্তু মা, তুমি যেরূপ সুন্দরী, তাহা দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হয়, যদি আমার মা, তোমার ন্যায় সুন্দরী হইতেন, তাহা হইলে আমিও কত সুন্দর হইতাম।" তৎপরে শিবাজী তাঁহাকে নূতন পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার দিয়া তাঁহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেন। দেখিলে, শিবাজীর কত গুণ ছিল!

ভাস্কর পণ্ডিত।

আলিবর্দ্দিখাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তাঁহার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মারহাট্টার লোকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখান হইতে চতুর্দ্দিকে অনেক দেশ জয় করিয়াছিল। যে সকল দেশ বশে রাখিতে পারিত না, তাহা বারংবার লুট করিত। তাহাদের লুট্‌পাট্‌ বন্ধ করিবার জন্য দুর্ব্বল রাজারা আপন আপন রাজস্বের চতুর্থাংশ তাহাদিগকে দিতেন; এই চতুর্থাংশ করকে মারহাট্টারা চৌথ বলিত। আলিবর্দ্দির শাসনকালে, নাগপুরের রাজা রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পঁচিশ হাজার মারহাট্টা সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা দেশে আগমন করিল। মারহাট্টারা চতুর্দ্দিকে লুটপাট আরম্ভ করে। পরে ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দ্দির নিকট দূত পাঠাইয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে দশ লক্ষ টাকা দাও, তাহা হইলে, আমি দেশে যাইব।" আলিবর্দ্দি এরূপভাবে সন্ধি করিতে অপমান বোধ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত অতি চতুর লোক ছিলেন, তিনি আলিবর্দ্দিখাঁর সেনাপতিদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে বশে আনিলেন। নবাবের মীর হাবীব নামে এক সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যোগ দিলেন। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শেঠের গৃহ হইতে দুই কোটী টাকা লুণ্ঠন করিলেন। মুরশিদাবাদের লোকেরা ও আলিবর্দ্দির কয়েকজন পরিজন আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গার উত্তর পারে গিয়াছিলেন। মীর হবীব মারহাট্টাদিগকে সঙ্গে লইয়া হুগলী

লুণ্ঠন করিলেন, যখন তিনি কলিকাতার নিকটে আসিলেন, তখন ইংরাজেরা আপনাদের দুর্গাদি পুনঃ নির্ম্মাণ করিলেন এবং নিজ বাসস্থান উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য তাহার চারিদিকে এক খাত খনন করেন। সেই খাত আর এখন দেখা যায় না; কিন্তু আজও পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে মারহাট্টা খাত বলে।

আলিবর্দ্দি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার নিজের সেনাপতিরাও তাঁহাকে উপযুক্ত সাহায্য করিল না; তিনি শেষে ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট দূত পাঠাইয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত সেই দূতকে কহিলেন, "তোমার প্রভুর সমস্ত দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতি সকলে অসন্তুষ্ট আছেন, আমার হস্তে উদ্ধার পাওয়া তাঁহার অসাধ্য; কিন্তু তিনি বাঙ্গালার প্রধান রাজা, অতএব যদি আমাকে এক কোটী টাকা ও অনেকগুলি হস্তী দেন, তবে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইব।" তাঁহার এই কথায় আলিবর্দ্দি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উত্তর করিলেন, "যাবৎ আমার এই দেহে প্রাণ থাকিবে, তাবৎ আমি এরূপ অপমানের কার্য্য করিব না।" আলিবর্দ্দি কৌশলে সেনাপতি-দিগকে বশে আনিলেন, ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত তাঁহার কয়েক স্থানে যুদ্ধ হইল; সেই সকল যুদ্ধে আলিবর্দ্দি জয়লাভ করিলেন। পরে ভাস্কর পণ্ডিতকে উড়িষ্যার দিকে তাড়াইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দি জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিপদ্ ঘুচিল না। তিনি যখন উড়িষ্যার দিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে তাড়াইয়া লইয়া যান, সেই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের পরামর্শে

তাঁহার প্রভু রঘুজী অন্য দিক্ দিয়া আসিয়া রাজধানীর নিকটে লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আর একদল মারহাট্টা সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। এবার গৃহযুদ্ধ বাধিয়া গেল। দ্বিতীয় দল রঘুজীকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল এবং আলিবর্দ্দির নিকট হইতে চৌথ লইয়া দেশে গমন করিল।

ইহার কিছুদিন পরে, ভাস্কর পণ্ডিত আবার বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া বাঙ্গালায় আসিলেন। আলিবর্দ্দিকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যদি চৌথ দেন, তবে দেশে ফিরিয়া যাইবেন নতুবা যুদ্ধ করিবেন। এবার আলিবর্দ্দি গোপনে ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতিকে এ বিষয়ে বলিলে, তিনি এরূপ কার্য্য করিতে প্রথমে স্বীকার করিলেন না। তৎপরে আলিবর্দ্দি তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইলেন ; লোভে পড়িয়া তিনি স্বীকার করিলেন। আলিবর্দ্দি সন্ধি করিবার ছলে তাঁহাকে ও আর একজন সেনাপতিকে মারহাট্টাদিগের নিকটে পাঠাইলেন। তাঁহারা ভাস্কর পণ্ডিতকে কহিলেন, "তুমি একবার আলিবর্দ্দিখাঁর সহিত দেখা করিতে আসিলে, তিনি তোমার কথায় সম্মত হইবেন।" ভাস্কর লোভে পড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন ; যেদিন তিনি আসিবেন, সেই দিন কয়েক জন সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গোপনে শিবিরের চারিদিকে রহিল। ভাস্কর ও তাঁহার অনুচরগণ আপন আপন তরবারির বাঁটে হাত দিয়া আলিবর্দ্দির শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তখন আলিবর্দ্দি আসন ত্যাগ

করিয়া তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়দিগের মধ্যে কে মহাবীর ভাস্কর ?" তাহাতে ভাস্কর নির্দ্দিষ্ট হইবামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এই দস্যুদিগকে হত্যা কর।" আদেশ মাত্র সৈন্যগণ ভাস্কর ও তাঁহার ভৃত্যদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহারাও অতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে পরাজিত হইয়া প্রত্যেকে হত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার কথা দেশে পৌঁছিলে মারহাট্টারা ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে লাগিলেন; অবশেষে আলিবর্দ্দি বাঙ্গালার চৌথ ও উড়িষ্যার দক্ষিণভাগ মারহাট্টাদিগকে দিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করেন।

লুফৎউন্নিসা।

আলিবর্দ্দিখাঁর একজন প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন, তাঁহার নাম সিরাজদ্দৌলা। সিরাজের সহিত লুফৎউন্নিসার বিবাহ হয়। তিনি দেখিতে যেমন সুশ্রী ছিলেন, তেমনি তাঁহার অনেক গুণও ছিল। তাঁহার মিষ্ট আলাপে ও শিষ্টব্যবহারে সিরাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে মাতামহের অতিশয় আদরে এবং মন্দ সঙ্গীদিগের কুপরামর্শে, সিরাজের স্বভাব অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। কিন্তু লুফৎউন্নিসা কিরূপে পতির মঙ্গল হইবে, সেই চিন্তাই সর্ব্বদা করিতেন। তিনি সকল সময়ে সিরাজের সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন।

সিরাজের পিতা জৈনুদ্দিন পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

দুর্বৃত্ত আফ্‌গানেরা তাঁহাকে হত্যা করিলে, আলিবর্দ্দিখাঁ সিরাজকে পাটনার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। জানকীরাম নামক একজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য সঙ্গে দিলেন। আলিবর্দ্দি সিরাজকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন;

সিরাজদ্দৌলা।

তাঁহাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে, তাঁহাকে নিজের নিকটে আনাইলেন। জানকীরাম পাটনার শাসনকর্ত্তা হইলেন। মেহেদীনেসা নামে একজন সিরাজের সঙ্গী তাঁহাকে কুপরামর্শ দিল; সে বলিল, "নবাব আলিবর্দ্দি আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতেছেন। দেখুন না জানকীরামকে পাটনার শাসনকর্ত্তা করিয়া আপনাকে নিজের নিকটে রাখিলেন; আপনি জানকীরামের হাত হইতে শাসন ভার কাড়িয়া লউন।" সিরাজও তাহার কথামত যুদ্ধযাত্রা

করিলেন। এই সময়ে নানারূপ বিপদ ঘটিতে পারে জানিয়া লুৎফংউন্নিসা তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। প্রথমে সিরাজ সম্মত হন নাই; তখন লুৎফং উন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, শেষে সিরাজ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, সিরাজ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। দেশের লোক তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। আলিবর্দ্দি খাঁ জীবিত থাকিতেই সঙ্গীদিগের কুপরামর্শে তিনি অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন নবাব হইয়া তাঁহার অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল। দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে নষ্ট করিবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সিরাজ সর্ব্বদাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেই সময়েও লুৎফংউন্নিসার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। একমাত্র তাঁহারই মিষ্টকথায় তিনি কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভ করিতেন। এই সতীরমণী ক্ষণকালের জন্য স্বামীকে নিজসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে দিতেন না।

দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে নবাব করিতে হইবে। তখন ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। দেশের লোকও তাঁহাদের ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ তখন কোম্পানীর

গবর্ণর ; তিনিও দেশের লোকের মন্ত্রণায় যোগ দিলেন। কলিকাতার চল্লিশক্রোশ উত্তরে এবং বহরমপুরের একাদশ ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথী নদীর তীরে, পলাশী নামক একটী স্থান আছে ; সেইখানে যুদ্ধ বাধিল। সিরাজের সেনাপতি পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ, সুতরাং তাঁহার পরাজয় হইল। তখন যাঁহারা তাঁহার স্বপক্ষে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে নগর রক্ষার পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহাকে পলায়ন করিতে উপদেশ দেন। সিরাজ তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য সকলের নিকট কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই স্বীকার করিল না ; একমাত্র লুফৎউন্নিসা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

দুই প্রহর রাত্রিতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজ, এক খানি সামান্য যানে লুফৎউন্নিসাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। পথে রাত্রি প্রভাত হইল, রৌদ্রে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, লুফৎউন্নিসা নিজের কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া রুমাল দিয়া সিরাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে ভগবানগোলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা-যোগে তাঁহারা রাজমহলে গমন করেন। একে পদ্মানদীর উত্তাল তরঙ্গ, তাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, সিরাজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। লুফৎউন্নিসা সিরাজকে আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং মিষ্টকথায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিন দিন, তিন রাত্র অনাহারে কাটিয়া গেল ; শেষে তাঁহারা রাজমহলের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সিরাজ তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহারা সাহদানা

নামক এক ফকিরের কুটীরে আশ্রয় লইলেন। এই ফকির পূর্ব্বে নবাবের নিকটে একবার অপমানিত হইয়াছিল। ফকির ভাবিল, তাহার অপমানের প্রতিশোধ লইবার এরূপ সুযোগ আর হইবে না। সে নবাবকে যথেষ্ট সমাদর করিল, তাঁহার আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল; এদিকে গোপনে পরপারে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের নিকট সংবাদ পাঠাইল। মীরকাশিম আসিয়া সিরাজকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে মীরজাফরের পুত্র মীরণ সিরাজকে হত্যা করিবার আজ্ঞা দেন। কেহই এই নির্দ্দয় কার্য্য করিতে চাহিল না; তখন আলিবর্দ্দিখাঁর অন্নে প্রতিপালিত মহম্মদীবেগ নামক একব্যক্তি এই নির্দ্দয় কার্য্যের ভার লইল; তাহার তরবারির আঘাতে সিরাজের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইল। খোসবাগ নামক স্থানে নবাবের দেহ সমাধিস্থ করা হয়। লুৎফৎউন্নিসাকে ঢাকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিছুদিন পরে সেখান হইতে আনাইয়া খোসবাগের সমাধি রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমাধির উপর ছড়াইয়া দিতেন। স্বামীর জন্য তাঁহার মনে এত কষ্ট হইত যে, মধ্যে মধ্যে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। সিরাজের সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়; সতী রমণী স্বামীর পদতলে চির নিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন। তাঁহার গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ সেই খোসবাগ এখনও সেই পবিত্র সমাধি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

রাণী ভবানী।

রাজসাহী জেলায় নাটোর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে রামকান্ত নামে একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। তাঁহারই পত্নীর নাম রাণী ভবাণী। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতিনা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। ভবাণী অতিশয় গুণবতী ও পরমা সুন্দরী ছিলেন বলিয়া রাজা রামকান্ত তাঁহাকে বিবাহ করেন।

রাজা রামকান্ত জমিদারীর কার্য্য ভালরূপে চালাইতে পারিতেন না; একারণ তাঁহার জমিদারী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। তিনি রামকান্তকে অযোগ্য দেখিয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র রতিকান্তের হস্তে জমিদারী অর্পণ করেন। কিন্তু পরে রাণী ভবাণী কৌশল করিয়া জমিদারী উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রাজা রামকান্তের মৃত্যু হয়। তৎপরে বিধবা রাণী ভবাণী জমিদারী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি জমিদারীর কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

রাণী ভবাণীর এক পুত্র জন্মিয়াছিল; শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরী, তিনিও বাল্যকালে বিধবা হইলেন। অবশেষে রাণী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ; করেন; এই পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। ইনি পরম ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক ছিলেন। রাণী ভবাণী এই দত্তক

লর্ড ক্লাইভ।

পুত্রের হস্তে বিষয়ের ভার দিয়া, বিধবা কন্যা সহ গঙ্গা তীরে বড় নগর নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। বড় নগরে রাণী ভবাণী নিজের বাস করিবার জন্য এক প্রাসাদ ও দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি এস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। ধর্ম্মকর্ম্ম ও পরোপকারই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। দেবসেবা, দুঃখার দুঃখমোচন, জলাশয় খনন প্রভৃতি

পুণ্য কার্য্য করিয়াই তিনি জীবন শেষ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমাদের দেশে তাঁহার নাম চিরকাল সকলে স্মরণ করিবে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

রাজসাহী জেলায় মান্দা গ্রামে কালাচাঁদ রায় নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার মাতা তাঁহাকে রাজু বলিয়া ডাকিতেন। রাজু গৌড় বাদসাহের দুলালীবিবি নামে এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হন। ক্রমে তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া পড়েন। তিনি মুসলমান হইলে, তাঁহার নাম মহম্মদ ফর্ম্মূলি হইল। তিনি হিন্দুদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেন এই জন্য

হিন্দুরা তাঁহাকে কালাপাহাড় বলিত ; এই নামেই তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা, কামরূপ, আসাম, কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ, ও বৃন্দাবনে হিন্দুদিগের দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া, বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়া একরূপ হিন্দুধর্ম্ম লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। আবার আরঞ্জেব বাদসাহও কাশী-ধামের হিন্দুধর্ম্মলোপের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাণী-ভবাণীর সময় ৺ কাশীধামের ঘোর বিশৃঙ্খলা ; কাশীর সীমানা নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। রাণী ভবাণী কাশীর সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রতি সীমাস্থানে শিব স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে দুর্গামন্দির ও অন্নসত্রপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি কাশীতে ৩৬৫ খানি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া-ছিলেন। ফলতঃ রাণী ভবাণীর যত্নেই কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের একরূপ পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। গয়াধামেও রাণী ভবাণীর কীর্ত্তি আছে।

আলিবর্দ্দীখাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইয়া দেশের লোকের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশের লোক সেই অত্যাচারে ক্ষেপিয়া উঠিল। জগৎ শেঠ তখন বঙ্গদেশে বিখ্যাত ধনী ছিলেন। তাঁহার গৃহে দেশের গণ্য মান্য সকলে গোপনে এক পরামর্শ করিলেন। তাহাতে সিরাজকে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে নবাবী দিবার কথা স্থির হইল। রাণী ভবাণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি, গোপনে এইরূপ রাজার বিরুদ্ধে পরামর্শ করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা কেহই শুনেন নাই।

বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এদেশে ভয়নাক দুর্ভিক্ষ হয়; লোকে ইহাকেই ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর বলে। তখন কার্টিয়ার এখানকার গবর্ণর। মহারাণী ভবাণী তখন অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী। তিনি কর্ম্মচারী-দিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "খাজনার জন্য কাহারও প্রতি যেন পীড়ন করা না হয়। কোন্ গ্রামে কে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, প্রতিদিন তাহার যেন সন্ধান লওয়া হয়। তারপর কোন্ গ্রামে কি ভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সংবাদ নিত্য নিত্য যেন আমাকে জানান হয়।"

দুর্ভিক্ষের সময় স্থানে স্থানে পীড়া হইতেছে সংবাদ পাইয়া মহারাণী অধিক সংখ্যক বৈদ্য নিযুক্ত করিলেন। কর্ম্মচারী-দিগকে বলিয়া দিলেন, "যে গ্রামে যখনই কেহ পীড়িত হইবে, যেন সে চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে মারা গিয়াছে একথা আমাকে শুনিতে না হয়।" সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রে যখন কর্ম্মচারীদিগের মুখে শুনিতেন যে, কেহ অনাহারে নাই, তখন তিনি স্নান আহার করিতেন। তাঁহার কন্যা তারাসুন্দরী আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিতেন, "মা, আমার কোথায় কোন সন্তান অনাহারে রহিয়াছে, আর আমি কি বলিয়া মুখে অন্ন দিব। সকলের সংবাদ অগ্রে পাই, তৎপরে আহার করিব।" এইরূপে অন্নসত্রে যখন টাকা নিঃশেষ হইয়া আসিল, নবাবের নিকট বৎসর বৎসর যে টাকা পাঠাইতে হয়, তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত খরচ হইল, তখন কর্ম্ম-চারীরা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি উত্তর করিলেন, "যদি আমার প্রজারাই মারা পড়িল, তবে আমার জমিদারী কাহাদের জন্য ?

আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি তাহাদিগকে বাঁচাইতে পার, তাহার ব্যবস্থা কর।” রাণী ভবাণী প্রত্যক্ষ অন্নপূর্ণা ছিলেন। তাঁহার দয়া, স্নেহ ও মমতার তুলনা নাই।

কান্তবাবু।

কান্তবাবুর অপর নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। বর্দ্ধমান জেলায় সিজ্‌না নামে একটী গ্রাম আছে। এইখানে কৃষ্ণকান্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। কৃষ্ণকান্তের পিতামহ কালী নন্দী সেখান হইতে কাশিমবাজারের শ্রীপুর নামক একটী পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করেন। কৃষ্ণকান্তের পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী। কৃষ্ণকান্ত সামান্য ইংরাজী ও পারসী জানিতেন, বাঙ্গালা হিসাবপত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কোম্পানীর কাশিমবাজারের রেশমের কুঠিতে একটী মুহুরী-গিরি কাজ পাইলেন। যাহা কিছু সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতেই তিনি কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

কিছুদিন পরে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরাজ বণিক-দিগের বিবাদ বাধিল। কোম্পানীর কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ শুনিলেন, নবাবের লোক কুঠি লুট করিতে আসিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন; কোন উপায় না দেখিয়া, কান্তবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কান্তবাবু কৌশল করিয়া হেষ্টিংস্‌কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিলেন; হেষ্টিংসের প্রাণরক্ষা হইল।

পরে হেষ্টিংস্ বড়লাট হইলেন। কান্তবাবুর নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হন, তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি কান্তবাবুর প্রত্যুপকার করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে একটী বড় জমীদারী দিলেন। তিনি কান্তবাবুকে রাজা উপাধি দিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু কান্ত বাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা ঐ উপাধি পায়, বড়লাট তাহাতেই সম্মত হন।

কান্তবাবুর পুত্র রাজা লোকনাথ; লোকনাথের পুত্র রাজা হরিনাথ; তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ। রাজা কৃষ্ণনাথ মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী। তোমরা বোধ হয় অনেকে মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম শুনিয়াছ, ইহাঁর দানের তুলনা নাই। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "মহারাণী" উপাধি দেন। পরে মহারাণীকে "ভারত মুকুট" এই সর্ব্বোচ্চ উপাধিও গবর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন কাশিমবাজারের রাজা।

রামশাস্ত্রী।

পেশওয়ারা শিবাজীর বংশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পেশওয়াগণের মধ্যে বাজিরাও বিশেষ বিখ্যাত। রামশাস্ত্রী পেশওয়া বাজিরাওয়ের মন্ত্রী ছিলেন। সেতারার নিকটে কোন স্থানে রামশাস্ত্রীর জন্ম হয়। তিনি কাশীতে নানা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া একজন সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ন্যায়াধীশ ছিল। মধুরাও যখন পেশওয়া হন, তখন

রামশাস্ত্রী জীবিত ছিলেন। মধুরাও রাত্র দিন, জপ তপ করিতেন, ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত মন ছিল; অল্প সময় রাজকার্য্য দেখিতেন। তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘব রাও অতি কৌশলে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। রামশাস্ত্রী একদিন মধুরাওকে বলিলেন, "দেখ, তুমি ব্রাহ্মণপুত্র, জপ তপ করাই তোমার কার্য্য; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছ, তখন উহাই তোমার ধর্ম্ম। জপ তপ করা অতি ভাল কার্য্য, আমি উহার জন্য তোমাকে নিন্দা করিতেছি না; কিন্তু যদি তুমি রাত্র দিন জপ তপ কর, রাজকার্য্য না দেখ, তাহা হইলে রাজ্যের অনেক বিশৃঙ্খলা হইবে, প্রজাদিগের মহা কষ্ট হইবে, অতএব নিয়মমত জপ তপ কর, আর রাজকার্য্যে ভাল করিয়া মন দাও।" মধুরাও রামশাস্ত্রীর কথামত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার কৌশলে মারহাট্টারা অনেক যুদ্ধে জয়ী হন। হঠাৎ মধুরাওয়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে রাঘব রাও ও তাঁহার স্ত্রী আনন্দবাই ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে নারায়ণ রাওকে হত্যা করিলেন। রামশাস্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। এই গুপ্তহত্যা যে রাঘবের দ্বারা হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি রাঘবকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এরূপ কার্য্য কেন করিলে?" রাঘবও এই অন্যায় কার্য্যের জন্য মনে মনে ভয়ানক অনুতাপ ভোগ করিতেছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণের মধ্যে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কারণ

রামশাস্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা ছিল, রাজ্যের সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিত, তাঁহার ন্যায্য বিচারে সকলে সুখী ছিল। রাঘব ভয়ে কাতর হইয়া বলিলেন, "আমার এই অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত কি ?" রামশাস্ত্রী উত্তর করিলেন, "এই গুরুতর কার্য্যের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তোমার প্রাণদণ্ড।" নরঘাতক রাজা সিংহাসনে বসিলে, সিংহাসন অপবিত্র হয়, রাজ্যে নানারূপ অমঙ্গল ঘটে, প্রজাদিগের দুঃখের অবধি থাকে না ; সুতরাং আমি রাজ্যের এ সমস্ত অমঙ্গল দেখিতে পারিব না, আমার মূহুর্ত্ত জন্যও আর এখানে থাকা উচিত নয়।" এই কথা বলিয়া রামশাস্ত্রী পুণা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাঘব অনেক মিনতি করিলেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বলিতে পারে নাই এবং আর কেহ কখন তাঁহাকে পুণাতেও দেখে নাই।

জবচার্ণক।

ইংলণ্ড হইতে একদল বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বণিকদলকে লোকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলিত। দীল্লির সম্রাট্ সাজাহান বাদসাহের এক কন্যা অগ্নিতে দগ্ধ হয় ; বাউটন নামক একজন কোম্পানীর ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করেন। সাজাহান বাউটনের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। তখন হুগলীতে

একটী কুঠী করিতে প্যারিলে, কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অত্যন্ত সুবিধা হয় বিবেচনা করিয়া, বাউটন বাদসাহের নিকট এ বিষয়ে অনুমতি চাহিলেন। বাদসাহ তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকার করিলেন। সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা তখন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বাউটনের অতিশয় বন্ধুত্ব ছিল। তিনিও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিলেন। হুগলীতে গঙ্গাতীরে কোম্পনীর একটী কুঠী নির্ম্মিত হইল। সা সুজার দয়ায় ইংরাজেরা পাটনা, ঢাকা, মালদহ, বালেশ্বর ও কাশীমবাজারে কুঠী নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন। সা সুজা যতদিন বাঙ্গলার নবাব ছিলেন, ততদিন কোম্পানী অতিশয় সুখে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য নবাবদের সময়ে আর তাঁহাদের সে সুখ থাকিল না। সেই দুঃসময়ে জবচার্ণক বাঙ্গালার কুঠী সকলের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনি কৌশলে, বুদ্ধিবলে ও সদ্ব্যবহারে বাদসাহের লোকজনকে বাধ্য করেন। তিনি উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে কোম্পানী আরঙ্গজেব বাদসার পৌত্র আজিমওসমানের নিকট হইতে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটী গ্রাম ক্রয় করিলেন। জবচার্ণক এই তিনটী গ্রাম লইয়া কলিকাতা মহানগরীর সূত্রপাত করেন। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে কলিকাতা মহানগরীর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ধরিতে গেলে তাঁহারই যত্নে ও বুদ্ধি-কৌশলে বাঙ্গলায় ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। জবচার্ণক সাহেবের নামানুসারে বর্ত্তমান চাণক গ্রামের নাম হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়।

হুগলি জেলায় রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়। ইনি সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। বাল্যকালে রামমোহন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। এখন যেরূপ ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে, সেকালে সেইরূপ আরবী ও পারসী ভাষার প্রচলন ছিল। রামমোহনের পিতা তাঁহাকে নয় বৎসর হইতেই আরবী ও পারসী পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুইটী ভাষা তিনি সুন্দররূপে শিক্ষা করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র। ভাব দেখি, বারবৎসরের বালকের পক্ষে এই দুইটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা কিরূপ বুদ্ধির কথা।

ইহার পর রামমোহন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি সংস্কৃতেও বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। আমাদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একধর্ম্মের প্রচলন আছে। রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার পিতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন ; তিনি দেখিলেন, হিন্দুধর্ম্মে রামমোহনের আস্থা নাই। সেজন্য তিনি পুত্রকে বিস্তর বুঝাইলেন, এমন কি তাঁহাকে শাসনও করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অবশেষে পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

রাজা রামমোহন রায়।

ষোল বৎসরের বালক গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া একাকী পদব্রজে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেকালে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি কিছুই ছিল না। পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করা যে কিরূপ অসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাবিয়া দেখ। কিন্তু এত কষ্টেও তিনি বিরত হইলেন না। তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বতে

উপস্থিত হন। তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধ; সেখানকার পুরোহিতদিগকে লামা বলে। রামমোহন লামাগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক আরম্ভ করেন; তাহাতে তির্ব্বতবাসীরা ভয়ানক কুপিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের উপক্রম করে। কিন্তু তির্ব্বতীয় রমণীদিগের কৃপায় তিনি প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।

রামমোহন গৃহে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার মাতাপিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পরে ধর্ম্মমত লইয়া পিতা পুত্রে পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার পিতা এবারেও তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় বার গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রামমোহন সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। রঙ্গপুর জেলার কালেক্টরের দেওয়ানী পদে তিনি তের বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই তের বৎসরের মধ্যে, বেতন হইতে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন। অবশেষে চাকরী ত্যাগ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় আসেন, এবং স্বজাতির সেবায় নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

রামমোহন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার আকৃতির মত প্রকৃতিও অতি সুন্দর ছিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদিগকে তিনি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন। বালক বালিকাদিগকে রামমোহন অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শিশুরা ছুলিবে বলিয়া তিনি উদ্যানের এক বৃক্ষে একটা দোল্‌না ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে শিশুদের সঙ্গে তিনিও মধ্যে

মধ্যে দুলিতেন। শিশুদের দোলা শেষ হইলে, নিজে দোলায় বসিয়া বলিতেন, "এইবারে আমার পালা"; সকলে মহা আনন্দে তাঁহাকে দোল দিত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ সরল ও মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামমোহন অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি এদেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইবে। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে এদেশে ছাপাখানা ছিল না, তাঁহার সময়ে প্রথম ছাপাখানা হয়। তিনি নিজব্যয়ে নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া বিতরণ করিতেন। রামমোহনের পূর্ব্বে এদেশে ভাল গদ্য রচনার প্রথা ছিল না; তিনিই প্রথম উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, তিনি একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া সে অভাব পূর্ণ করেন। ভূগোল ছিল না, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ভূগোল লিখেন। খগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া দেশের লোকের জ্ঞান লাভের উপায় করেন। তাঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়া ছিল।

এদেশে হিন্দু সমাজে সতীদাহ বলিয়া এক প্রথা ছিল। স্বামীর মৃতদেহের সহিত জীবিত স্ত্রীকেও দাহ করা হইত। স্বামীর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোন কোন স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে যাইতেন। আবার কখন কখন স্ত্রীর অনিচ্ছা থাকিলেও বলপূর্ব্বক তাহাকে মৃত স্বামীর সহিত দাহ করা হইত। এই প্রথা নিবারণের জন্য রামমোহন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আমাদের

বড়লাট ছিলেন। রামমোহনের পরামর্শেই তিনি এই প্রথা ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দেন।

ভারতবাসীদিগের মধ্যে রামমোহনই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ সমুদ্রযাত্রা করেন নাই। তখন সাহ আলম দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট ছিলেন। তিনি দল্লীর মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের রাজা ও রাজসভার নামে এক পত্র লইয়া বিলাতযাত্রা করেন। দিল্লীর সম্রাটই রামমোহনকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন।

বিলাতের লোকেরা রাজা রামমোহনকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং অশেষ গুণে গুণবান্ ছিলেন বলিয়াই রামমোহন বিলাতে সম্মান পাইয়াছিলেন। বিলাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর। তথায় তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ডেভিড্ হেয়ার।

ডেভিড্ হেয়ার স্কট্লণ্ড দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঘড়ির-ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র; ডেভিড্ সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাল্যকালে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া পিতার নিকট ঘড়ির কার্য্য শিক্ষা করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়, হেয়ার কলিকাতায় আসিয়া ঘড়ির ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন। তৎপরে গ্রে নামক একজন বন্ধুকে আপনার কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি এদেশের লোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না; সকলকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। তখন এদেশে যাত্রা, নাচ, কবি, পাঁচালী, হাফ্ আঁখড়াই, বুলবুলের লড়াই প্রভৃতি

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক।

নানা প্রকার আমোদের ব্যাপার ছিল। হেয়ার সাহেব সেই সকল অমোদপ্রমোদে, এদেশের লোকদিগের সঙ্গে যোগ দিতেন। তিনি দেখিলেন যে, বাঙ্গালিদের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ, তাহারা পরিশ্রমী; বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। এদেশে তখন এখনকার মত স্কুল কলেজ ছিল না। স্থানে স্থানে যে কয়েকটী পাঠশালা ছিল, তাহাতে বঙ্গভাষায় সামান্য অঙ্কবিদ্যা, পত্র-লিখন, জমাওয়াশীল

বাকী ও গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ ও গঙ্গার বন্দনা, শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ঐ সকল পাঠশালার ছাত্রেরা শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিত না ; রীতিমত ইংরাজী স্কুল একটীও ছিল না। মহামতি হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় ও যত্নে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ কলেজের নামই পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইয়াছে। তিনি আরপুলী, পটলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে, ভাল ভাল পাঠশালা স্থাপন করেন এবং পটলডাঙ্গাতে একটী ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করিয়া ছিলেন ; এই স্কুলের নামই পরিশেষে হেয়ার স্কুল হইয়াছে। দানশীল হেয়ার সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পুস্তক, কাগজ ও কলম প্রভৃতির ব্যয় নিজে বহন করিতেন। এইরূপে কত প্রকারে যে তিনি দান করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তখন আমাদের বড় লাট। হেয়ার তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং বাঙ্গালিদিগকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় একটী মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। তোমরা পটলডাঙ্গায় গোলদীঘির নিকটে যে মেডিকেল কলেজ দেখিতে পাও, ইহা সেই মহামতি হেয়ার সাহেবের যত্ন ও চেষ্টার ফল।

যাহাতে স্কুলের ছাত্রগণ সচ্চরিত্র হয়, সে দিকেও হেয়ার সাহেবের লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দশটার মধ্যে আপনার আহার সমাপ্ত করিয়া পাল্কী চড়িয়া পুস্তক ও ঔষধাদি লইয়া বাহির হইতেন, এবং প্রথমে হিন্দু কলেজ ও তৎপরে আপনার

স্কুলে ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপস্থিতি লিখিবার বহি দেখিয়া অনুপস্থিত বালক-দিগের নাম লিখিয়া লইতেন। পরে তিনি প্রত্যেক শ্রেণীতে কোন ছাত্র কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে ও কি ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। কাহারও চরিত্রে কোনরূপ দোষ দেখিলে, অতি কৌশলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার এমন একটা আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে, যে দুর্দ্দান্ত বালকগণকে তাহাদের মাতাপিতা শাসন করিতে পারিতেন না, মহাত্মা হেয়ার তাহাদিগকে সহজে সুপথে আনিতেন। স্কুলের ছুটীর সময়, একখানি রুমাল হাতে করিয়া তিনি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং কোন বালককে অপরিষ্কৃত দেখিলে, সেই রুমাল দিয়া তাহাকে সুন্দররূপে পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন। তৎপরে হাসিতে হাসিতে তাহার কপোলে একটী চুম্বন করিয়া আনন্দিত হইতেন। তিনি মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে নিজে যাইতেন। সেখানে রোগী সকল যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন; সময়ে সময়ে নিজেও রোগীদিগের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। লেখাপড়া শিখিয়া কেহ কর্ম্ম না পাইলে, তিনি অনুরোধ করিয়া তাহার কর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দিতেন। দুর্গোৎসবের সময়, প্রতি বৎসর তিনি অনেক দরিদ্র বালকবালিকাকে ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। সাতষট্টি বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁহার ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করিতে পারিব না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন দেশবিখ্যাত লোক। তাঁহার পিতা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৮২০ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি নিজের গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার পিতা কলিকাতায় সামান্য বেতনে মুহুরীর কার্য্য করিতেন। উত্তমরূপে পুত্রকে লেখাপড়া শিখান তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, সেইজন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র পথিমধ্যে স্থানে স্থানে প্রস্তরফলক প্রোথিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন ইংরাজী জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার এত বুদ্ধি ছিল যে, পথ চলিতে চলিতে এই সকল প্রস্তরফলক দেখিয়াই এক দুই ইত্যাদি অঙ্ক শিক্ষা করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর; তাঁহার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি কত কষ্টে ও কত পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইবে। দুইবেলা তাঁহাকে রাঁধিতে হইত। রাত্রে রাঁধিতে রাঁধিতে যে সময় পাইতেন তাহাতে পাঠ অভ্যাস করিতেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ হইলে তিনি এত পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দান করেন। তিনি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন অতি অল্পই ইংরাজী জানিতেন। কিন্তু কলেজ ত্যাগের পর তিনি ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বঙ্গভাষার জন্মদাতা বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর অতিশয় তেজস্বী ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করেন তখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত সামান্য কারণে তাঁহার মনোবিবাদ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ৫০০৲ শত টাকার চাকুরি ত্যাগ করেন। হ্যালিডে সাহেব তখন ছোটলাট ছিলেন; তিনি বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি এত টাকা বেতনের চাকুরি ত্যাগ করিলেন, আপনার সংসার কিরূপে চলিবে?" তাহাতে বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, "এখন দুইবেলা আহার করিতেছি, পরে না হয় একবেলা আহার করিব, যদি তাহাও না জুটিয়া উঠে, তবে একদিন অন্তর আহার করিব, তথাপি যাহা মন্দ বলিয়া জানি, তাহা কখন করিতে পারিব না।"

বিদ্যাসাগরের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের সময় বাটী যাইবার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তখন তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ছুটি চাহিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ছুটি না পাইলে মাতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন না, এই দুঃখে তিনি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তৎপরে চাকুরি ত্যাগ করিবেন, স্থির করিলেন। সাহেবকে সে কথা জানাইলেন; সাহেব সে কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে ছুটি দিলেন। একজন চাকর সঙ্গে করিয়া তিনি বাটী চলিলেন। তখন বর্ষাকাল; দামোদর নদের দুকুল ভাসিয়া গিয়াছে; বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া দামোদর পার হইলেন, আর্দ্র বস্ত্রে, দ্রুতপদে বাটী গিয়া

উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ভ্রাতা বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তিনি বাটী যান নাই বলিয়া মাতা দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি উচ্চৈস্বরে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মাতা ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন; উভয়ে উভয়কে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে রোদন আর থামে না। যেমন মা তেমনি পুত্র; এমন মা না হইলে কি এমন পুত্র হয়? মাতার মৃত্যু হইলে, বিদ্যাসাগর পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত অনবরত রোদন করিতেন।

মাতাপিতার প্রতি বিদ্যাসাগরের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, "পিতামাতা সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা"। তিনি মাতাপিতার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শয়নকক্ষে রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদিগের প্রতিমুর্ত্তি দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া অন্য কার্য্য করিতেন।

তিনি বালক বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় বাঙ্গালা পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন আমাদের বড়লাট ছিলেন। তিনিও ছোট লাট গ্রাণ্ড সাহেব এবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করেন। ভদ্রবংশীয় হিন্দু বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। বালিকাবয়সেও যদি কেহ বিধবা হয়, আর তাহার বিবাহ হইবে না। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসী ও ছোটলাট গ্রাণ্ড সাহেব তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

বিদ্যাসাগর কিরূপে পরের উপকার করিবেন, তাহাই সর্ব্বদা

ভাবিতেন। এজন্য সর্ব্বত্রই তাঁহার সমান আদর ছিল। এক সময়ে তিনি ছোটলাট গ্রে সাহেবের সহিত দেখা করিতে যান। চাপরসীকে দিয়া তিনি প্রথমে সংবাদ পাঠাইলেন; বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ছোটলাট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া অনিতে বলিলেন। তাঁহার যাইবার অনেক পূর্ব্বে কয়েক জন গণ্যমান্য বড়লোক ছোটলাটের সহিত দেখা করিবার জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন। ছোটলাট অগ্রে বিদ্যাসাগরকে ডাকিলেন দেখিয়া, তাঁহারা সকলে বিরক্ত হইলেন এবং বড়.লাটের নিকট ও তাহা জানাইলেন। বড়লাট ছোটলাট গ্রে সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন "বিদ্যাসাগর অতিশয় বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, দেশের যাহাতে উপকার হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন; আর বড় লোকেরা নিজেদের উপকারের প্রত্যাশায় অসিয়া থাকেন। এইজন্য আমি বিদ্যাসাগরকে প্রথমেই দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছিলাম।"

বিদ্যাসাগরের ন্যায় করুণার সাগর, স্নেহের উৎস, ভক্তির অবতার, নিরন্নের অন্নদাতা, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা, এ জগতে অতি বিরল। ১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে ইনি পরলোক গমন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর ধনে, মানে ও জ্ঞানে তখন কলিকাতার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দুইবার ইংলণ্ডে গমন করেন। লর্ড এলেন-বরা তখন আমাদের বড়লাট ছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি নিজে অসীম ধনী দেখাইবার জন্য অপরিমিত ব্যয় করেন। বিলাতে দ্বারকানাথ এরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, সেখানকার গণ্যমান্য লোকে তাঁহাকে 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলিয়া ডাকিতেন।

দ্বারকানাথ যখন পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার অনেক টাকা ঋণ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর, তাঁহার বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইল। আর কিছু পাইবার আশা নাই ভাবিয়া ঋণদাতাগণ অধীর হইয়া পড়িলেন। দ্বারকা-নাথের বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতক-গুলি ট্রাষ্ট সম্পত্তি থাকায়, তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদার গর্ডন সাহেব ঋণদাতাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, "ট্রাষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত আর যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তোমারা বিক্রয় করিয়া লইতে পার।" কিন্তু তাহাতে ঋণ শোধের কোন আশা নাই দেখিয়া উত্তমর্ণগণ শোকাকুল হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আপনাদের হস্তে দিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।" দেবেন্দ্রনাথের এই সাধু ব্যবহারে উত্তমর্ণগণের মধ্যে অনেকে অশ্রু সম্বরণ করিতে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পারিলেন না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যখন দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ট্রাষ্ট সম্পত্তি পর্য্যন্ত আমাদের হস্তে দিতেছেন, তখন ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক ২৫০০০ সহস্র মুদ্রা আমরা দিব।

এইরূপে উত্তমর্ণগণ তাঁহাদের জমিদারীর রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইল, কিন্তু ঋণ শোধের কোন ব্যবস্থাই হইল না। তখন দেবেন্দ্রনাথ উত্তমর্ণগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের হস্তে কার্য্য নির্ব্বাহের ভারার্পণ করুন, আমরা ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিব। দেবেন্দ্রনাথের সাধুতায় পূর্ব্বেই তাঁহার উপর উত্তমর্ণ-গণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ গৃহসজ্জার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলেন। গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ করিলেন, এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে পিতৃঋণ শোধ দিলেন, সাধুতার জয় হইল। তিনি একজন প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করেন। লোকে তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া ডাকিত।

রণজিৎসিংহ।

রণজিৎ পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহাসিংহ। রণজিতের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দেওয়ান লক্ষীপৎসিংহ তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রণজিৎ বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও রণকুশল ছিলেন। আফগান্ জামনসাহ তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা; বিতস্তা নদীতে তাঁহার কতকগুলি কামান পড়িয়া যায়, রণজিৎ অতি

কষ্টে সেইগুলি উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে দেন। জামানসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লাহারের শাসনকর্ত্তা করেন। রণজিৎ কিছুদিনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি মুলতান হইতে আফগান্‌দিগকে তাড়াইয়া দিলেন। প্রথমে কাশ্মীর ও শেষে

রণজিৎসিংহ।

পেশোয়ার জয় করিলেন। পরিশেষে কাবুল নদীর তীরে নওশেরার যুদ্ধে আফগান্‌দিগকে পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন। তিনি গুরু নানকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে শিখেরা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। রণজিৎ এক চক্ষুহীন ছিলেন এবং লেখা পড়া জানিতেন না; এমন কি, কোন কাগজপত্রে সহি করিতে হইলে তিনি তাহার পরিবর্ত্তে হাতের পাঞ্জা দিতেন। রণজিৎ একজন সাধু-

পুরুষ ছিলেন। তিনি এরূপ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন যে, ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে কাণা বলিতে সাহস করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না। একদিন রণজিৎ নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছন, এমন সময়ে একজন সৈনিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, এক

লর্ড ডালহৌসী।

উলঙ্গ সন্ন্যাসী পথ অবরোধ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে উঠিয়া যাইতে বলায়, সে বলিল, "আমি নিজে সাহনসাহ্ (বাদসাহের বাদসা), তোমার রাজাকে অন্য পথ দিয়া যাইতে বল।" সৈনিকের কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা তাঞ্জাম হইতে নামিয়া সত্বর সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভো, একবার দয়া করিয়া এদাসের

কুটীরে পদধূলি দিয়া দাসকে কৃতার্থ করিবেন কি ?” সাধু তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। রাজা সাধুকে তাঞ্জামে বসাইলেন এবং নিজে পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিলেন। পরে সাধুকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণীকে তাঁহার চরণ ধুইয়া দিতে বলিলেন। তখন তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভো! আপনার একখানি কৌপীন কিম্বা একটী কমণ্ডলুও নাই; আপনি বাদসাহের বাদসাহ, সাহনসাহ্ হইলেন কি প্রকারে ?” সাধু উত্তর করিলেন, “যিনি পলকের মধ্যে কোটি কোটি পৃথিবীর সৃষ্টি ও লয় করিতে পারেন, যাঁহার দয়ায় সামান্য ভিক্ষুকও মহারাজ হইতে পারে, সেই ঈশ্বর যাহার সর্ব্বস্বধন, সে সাহনসাহ্ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?” রণজিৎ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাহনসাহের ত অনেক সৈন্য থাকে, অনেক ধন থাকে, তাহাই বা আপনার কোথায় ?” সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, “যে রাজ্যে অশান্তি, শত্রুতা, দস্যুভয় ও সন্দেহ আছে, সেই রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্যের আবশ্যক; কিন্তু যে রাজ্যে ভয় নাই, শত্রুতা নাই, কেবল শান্তি রহিয়াছে, সেখানে সৈন্যের আবশ্যক কি ? আর ধনের কথা যাহা বলিলে, তাহার উত্তর এই যে, রাজার নিকট অসংখ্য ধনরত্নের যে মূল্য, একজন ভিক্ষুকের নিকট একখানি কম্বারও সেই মূল্য; কারণ এই দুইজনের এই দুইটী জিনিষের উপর সমান যত্ন। রাজাদের ধন না হইলে চলে না বটে, কারণ তাঁহাদের বাসনা বড়ই প্রবল, তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইলেও তাঁহাদের আশা মিটে না। তাই বলিতেছি, দশজন ভিক্ষুক একখানি মাত্র কম্বলের মধ্যে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে,

কিন্তু দুইজন বাদসাহ একটী রাজ্যে বাস করিতে পারে না। ভিক্ষুক সন্ধ্যার সময় একখণ্ড রুটি খাইয়া তৃপ্তিলাভ করে, কিন্তু বাদসাহেরা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য পান ভোজন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না। মহারাজ, যাঁহার সন্তোষধন লাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পত্তি ধূলার সমান।”

এইরূপ ভাবে কথা চলিতেছে, এমন সময়ে, পাচক নানা প্রকার খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিল। রণজিৎ ফকিরকে ভোজন করিতে নিবেদন করিলেন; রাণী চামর ব্যাজন করিতে লাগিলেন। ফকির সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। রণজিৎ তখন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আপনাতে ও আমাতে প্রভেদ কি? সাধু উত্তর করিলেন, “তোমাতে ও আমাতে আকাশ পাতালের প্রভেদ। কারণ, তোমার এই সকল উৎকৃষ্ট আহারের দ্রব্য না হইলে চলে না, কিন্তু আজ আমার জুটিল খাইলাম না জুটিলেও কোন কষ্ট নাই। আমার জীবনের একটী কথা বলিতেছি মন দিয়া শুন। আজ তিন দিন হইল আমি একটী বালুকাময় চরের উপর পড়িয়াছিলাম, সমস্ত দিন আহার জুটে নাই। দ্বিতীয় দিন এক জঙ্গলে ছিলাম সেখানে সমস্ত দিনের পর একমুষ্টি ছোলা জুটিয়াছিল, আর আজ রাজার আসনে বসিয়া রাজভোগ খাইতেছি, দেখ এই তিন অবস্থাই আমার পক্ষে সমান। কিন্তু যদি কোন দিন একটী ব্যঞ্জনে একটু লবণ অল্প হয়, তাহা হইলে হয় ত তুমি পাচকের মস্তক-

ছেদনের আদেশ দিবে। তাই বলিতেছি, তোমাতে আমাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ।”

আর একটী কথা বলিতেছি, মন দিয়া শুন। “তোমার মাতাপিতা বাল্যকালেই তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; তজ্জন্য তোমার নাম রণজিৎ রাখিয়াছেন। তুমি যথার্থই একজন বীরপুরুষ; কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও যে, সহস্র সহস্র রণজয় করা অপেক্ষা নিজের একটী মন জয় করা অতিশয় কঠিন। তোমার নাম রণজিৎ না রাখিয়া যদি তোমার মাতাপিতা মনোজিৎ রাখিতেন, তাহা হইলে. আমি আজ অতীব সন্তুষ্ট হইতাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমাকে ও আমার মত ফকিরদিগকে মনোজিৎ করুন।

ইংরাজদিগের সহিত রণজিতের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র পড়ে। তিনি তাহার স্থানে স্থানে লালচিহ্ন দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এস্থানগুলি কাহাদের অধিকারে আছে?” উত্তরে জানিতে পারিলেন, ইংরাজদিগের অধিকার গুলিতে লালচিহ্ন দেওয়া থাকে। ইহা শুনিয়া, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “সব লাল হো জাগা।” কালে সমস্ত ভারতবর্ষই ইংরাজদিগের অধিকারে আসিয়াছে। রণজিতের মৃত্যুর পর শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের ছয়টী ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড ডালহৌসী আমাদের বড়লাট ছিলেন।

সারসালার জঙ্গ।

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে; উহার উত্তর ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ। নিজাম উল্‌মুলুক্ নামে আরঙ্গজেব বাদসাহের দাক্ষিণাপথের এক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাদসাহের মৃত্যুর পর, তিনি স্বাধীন হন এবং নর্ম্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন। হাইদরাবাদ তাঁহার রাজধানী হইল। ইংলণ্ডের একদল বণিক যেমন বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ফ্রান্স দেশের একদল বণিকও এদেশে বাণিজ্য সূত্রে আগমন করেন। তখন ইংরাজদিগের পক্ষে রবার্ট ক্লাইব এবং ফরাসীদিগের পক্ষে ডিউপ্লে, কিরূপে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তাঁর করিবেন, সেই সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু ক্লাইব নিজে যুদ্ধবিদ্যা জানিতেন, ডিউপ্লে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না; সেইজন্য ক্লাইবই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। নিজাম উল্‌মুল্‌কের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজিরজং ও দৌহিত্র মজফরজং, উভয়ে সিংহাসন লইয়া গোল বাধাইলেন। ক্লাইব নাজিরজংএর এবং ডিউপ্লে মজফরজংএর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইংরাজের জয় হইল; তাঁহারা নিজামের বন্ধু হইলেন।

তোমরা কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছ, উহার বর্ত্তমান নাম মহীশূর; সেখানে এই সময়ে হায়দরআলি নামে একজন মুসলমান প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহার ও তৎপুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। প্রত্যেক বারেই নিজাম সাহায্য করিয়াছিলেন, একারণ যুদ্ধজয়ের

লর্ড কর্ণওয়ালিস। লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

পর ইংরাজেরা মহীশূরের কিয়দংশ নিজামকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেস্‌লি আমাদের বড়লাট ছিলেন। ওয়েলেস্‌লি নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক করদ ও মিত্র রাজ্যে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন। সার

সালার জঙ্গ নিজামের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে নিজাম রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। রাজকোষ অর্থপূর্ণ ও প্রজার সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইল। সার সালার জঙ্গ চারি বৎসরের মধ্যে রাজ্যে সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন।

টিপুসুলতান। হাইদারআলি।

এই সময়ে এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা সিপাহীদিগকে যে বন্দুক ব্যবহার করিতে বলেন, তাহার টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। এই বন্দুকের টোটায় গরুর ও শূকরের চর্ব্বি আছে বলিয়া সিপাহীদিগের সন্দেহ হয়। আবার গবর্ণমেণ্ট হিন্দু সিপাহীদিগকে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করিতে বলেন যে, বিদেশে যাইবার প্রয়োজন

হইলে, তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সিপাহীরা মনে করিল, তাহাদিগকে খৃষ্টান করাই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ; এইজন্য তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। ওদিকে লর্ড ড্যালহৌসী দেশীয় অনেক নিঃসন্তান রাজার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন এখন তাঁহারা সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহে 'যোগ দিলেন। কলিকাতার নিকট বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠে। ক্রমে মীরাট, দিল্লী, কাণপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্টকে তারযোগে সংবাদ দিলেন, দেখিবেন, সাবধান ! যদি নিজাম আমাদের পক্ষ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, আমাদের আর কিছু আশা ভরসা থাকিবে না।" সালার জঙ্গ রেসিডেণ্ট সাহেবকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার প্রাণ থাকিতে আমি নিজাম বাহাদুরকে কখনই ইংরাজ রাজের বিপক্ষ হইতে দিব না।"

এই সময়ে বৃদ্ধ নিজাম নাজিমর্দ্দৌলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্র আফজলুদ্দৌলাকে ডাকিয়া, দেওয়ান সালার জঙ্গের সম্মুখেই এই উপদেশ দিলেন যে, দেখিও, সাবধান, প্রাণ থাকিতে আমাদের পরম বন্ধু ইংরাজ রাজের বিপক্ষ হইও না। ইহার কয়েক দিন, পরে সংবাদ আসিল, দিল্লী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইয়াছে এবং নামমাত্র মুসলমান সম্রাট্ বাহাদুর সা প্রকৃতই বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। এই সংবাদে

নিজাম, দেওয়ান ও কয়েকজন অনুচর ব্যতীত আর সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং নিজামকে ও দেওয়ানকে তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এমন কি তাহারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার ভয়ও দেখাইয়াছিল। কিন্তু দেওয়ান তাহাদের কথা শুনেন নাই। সেই সময়ে সালার জঙ্গ কৌশলে সকল দিক্ রক্ষা না করিলে, ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইত। পরে বিদ্রোহের শান্তি হইল; লর্ড ক্যানিং তখন আমাদের বড়লাট, তাঁহার আদেশে রেসিডেণ্ট সাহেব এক দরবার করিলেন এবং নিজামকে কে, সি, আই, ই উপাধি ও বহুমূল্য উপহার দিলেন। দেওয়ানকে সার উপাধি এবং পারিতোষিক দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজ রাজ সার সালার জঙ্গকে জি, সি, এস, আই উপাধি দিয়াছিলেন। তখনকার যুবরাজ (মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিলে, সার সালার জঙ্গ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পর বৎসর তিনি ইউরোপ দর্শনে সদলে বহির্গত হন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি পরম সমাদর প্রাপ্ত হন; এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়া উইণ্ডসোর প্রাসাদে তাঁহার সহিত একত্র আহার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সার সালার ইংলণ্ডে যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন, আর কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার পিতা ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পুত্র। তিনি জর্ম্মানীদেশের রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মেরি লুইসাকে বিবাহ করেন। ইংলণ্ডের কেনসিংটন নামক রাজগৃহে ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। তিনি যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন তাঁহার নাম আলেক্‌জান্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া হইল। বাল্যকালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; তাঁহার মাতা বুদ্ধিমতী, গুণবতী ও সুশীলা রমণী ছিলেন। তিনি অতি যত্নে কন্যাকে সুশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যার ইংলণ্ডের মহারাণী হইবার সম্ভাবনা আছে। ভিক্টোরিয়া, মাতার সুশিক্ষায়, অশেষ গুণ লাভ করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই সত্যের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। একদিন পড়িবার সময়ে, তিনি শিক্ষয়িত্রীর নিকট কয়েকবার অবাধ্য হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার মাতা তাহা জানিতে পারিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার মাত্র অবাধ্য হইয়াছিল।" ইহা শুনিয়া ভিক্টোরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি দুইবার অবাধ্য হইয়াছিলাম।" তাঁহার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি ইংলণ্ডের মহারাণী হন। ইহার কিছুদিন পরে জর্ম্মানীর অন্তর্গত সেক্‌সকোবর্গের রাজকুমারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এরূপ মাতৃভক্তি ছিল যে, মাতার ভয়ানক পীড়া হইলে, তিনি তাঁহার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবারাত্র

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেন। মাতার মৃত্যু হইলে, পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার ন্যায় 'মা,' 'মা,' বলিয়া সর্ব্বদা রোদন করিতেন। বাকিংহাম রাজগৃহে তাঁহার প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়া অডিলেডের জন্ম হয়। ইহার পর বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আলবার্ট এডওয়ার্ড জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীরা যাহাতে সচ্চরিত্র হন, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। একদিন রাজকুমারীরা একজন পরিচারিকার পোষাকে রং মাখাইয়া দেন। মহারাণী ইহা জানিতে পারিয়া রাজকুমারীদিগকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন এবং তাঁহাদের মাসিক বৃত্তির টাকা হইতে পরিচারিকাকে একটী নূতন পোষাক কিনিয়া দিলেন। মহারাণী অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন; পরের দুঃখের কথা শুনিতে পাইলে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করিতেন। এক সময়ে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কোন হাঁসপাতালের একটী পীড়িতা বালিকা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তাহার বিশ্বাস, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, তাহার পীড়ার উপশম হইবে। এই কথা শুনিয়া, দয়াবতী মহারাণী নিজে সেই হাঁসপাতালে বালিকাটীকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

সামান্য জিনিষটি পর্য্যন্ত মহারাণী যত্ন করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার উপহার আসিত। ঐ সকল উপহার সুন্দর সুন্দর ফিতা ও সূতা দ্বারা বাঁধা থাকিত। মহারাণী ঐ সকল ফিতা ও সূতা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন।

ঐ সকল সূতা ও ফিতার মূল্য ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হইয়াছিল।

খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এক সময় আফ্রিকার একজন রাজা মহারাণীর নিকট উপঢৌকন পাঠান এবং দূতকে মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন, যে, "তাঁহার এরূপ উন্নতির কারণ কি?" তিনি দূতকে একখানি বাইবেল দিয়া বলিলেন, ইহাই তাঁহার উন্নতির প্রধান কারণ, অর্থাৎ ধর্ম্মে অচলা ভক্তিই তাঁহার এরূপ উন্নতির মূল। ৮২ বৎসর বয়সে মহারাণীর মৃত্যু হয়। তিনি ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী ছিলেন; তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডের নানারূপ উন্নতি হয়। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি সকল স্থানেই মহারাণীর রাজ্য আছে। এইজন্য লোকে বলিত, 'মহারাণীর রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না।' তাঁহার ন্যায় কোন রাজা বা রাণী প্রজাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে মনে করিয়াছিল, যেন সত্য সত্যই সকলে মাতৃহারা হইল। তাঁহার রাজ্যের সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী কোম্পানীর হস্ত হইতে স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রজার ধর্ম্মের উপর হাত দিবেন না। যে কোন প্রজা উপযুক্ত হইলে, তিনি তাহাকে উচ্চ রাজ-পদ দিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের

উপকারের জন্যই তিনি ভারতবর্ষ শাসন করিবেন ; যাহাতে শিল্পের উন্নতি হয়, সাধারণের মঙ্গল হয়, এইরূপ কার্য্য করিবেন ; কারণ ভারতের সমৃদ্ধি বাড়িলে তাঁহারই বল বৃদ্ধি হইবে ; ভারতের প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে, তাঁহারই বিপদ দূর হইবে ; ভারতের প্রজা কৃতজ্ঞ হইলে, তিনি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিবেন।” মহারাণীর এই সকল কথাগুলি আমাদের পক্ষে চিরকাল আশ্বাসবাণী হইয়া থাকিবে।

পিয়ারীচরণ সরকার।

কলিকাতার চোরবাগানে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে পিয়ারী-চরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাল্যকালে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পিয়ারীচরণ হেয়ার সাহেবের বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া হিন্দু কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি ধীর, বুদ্ধিমান্ ও সুশীল ছিলেন।

হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ হইলে, তিনি হুগলী ব্রান্স স্কুলে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে একজন শিক্ষক হন। সেখানে কিছুকাল কার্য্য করিয়া বারসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। পরে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হন। ৫২ বৎসর বয়সে পিয়ারী-চরণের মৃত্যু হয়। তিনি এদেশের বালকদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি ইংরাজী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন।

পরের উপকার করা পিয়ারীচরণের জীবনের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি দীনহীন বালক ও অনাথা অসহায়া বিধবাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত প্রতি মাসে প্রায় ১২৫৲টাকা দান করিতেন। সার জন লরেন্স যখন আমাদের বড়লাট তখন উড়িষ্যায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ক্রমে মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া জেলাতেও দুর্ভিক্ষের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। তখন যে কত নিরন্ন কঙ্কাল-সার নরনারী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় নাই। তাহাদের দারুণ কষ্ট দেখিয়া পিয়ারী-চরণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি নিজে অন্নসত্র খুলিয়া দিয়া শত শত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে, অনুরোধে ও উপদেশে কলিকাতার অনেক দানশীল লোক, তাঁহার ন্যায় অন্নসত্র খুলিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সার সিসিল বীডন তখন আমাদের ছোটলাট ছিলেন। তিনি প্রথমে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। পরে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

জুবিলী।

লর্ড ডফারিণ যখন আমাদের বড়লাট, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এই শুভ

ঘটনার উপলক্ষ্যে মহারাণীর রাজ্যের সকল স্থানেই মহা ধূমধামের সহিত জুবিলী উৎসব হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধনী ; নির্ধন সকল প্রজাই নানপ্রকারে নিজ নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে প্রত্যেক গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। রাজপথ ও প্রত্যেক গৃহ .পত্রপুষ্পে ভূষিত করা হয়। খৃষ্টীয়ানেরা গির্জ্জায়, মুসলমানেরা মসজিদে এবং হিন্দুরা দেবমন্দিরে মহারাণীর মঙ্গল কামনায় উপাসনা করিয়াছিলেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাজি পোড়ান প্রভৃতি নানারকম আমোদ হইয়াছিল। ধনী প্রজারা দরিদ্রদিগকে ধন, বস্ত্র ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এই জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে একমাত্র মুসলমান সম্রাট্ আকবর একক্রমে ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভাগ্যবতী ছিলেন, তিনি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক একক্রমে রাজত্ব করেন। পুণ্যবতী, করুণার মূর্ত্তি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড এল্‌গিন যখন আমাদের বড়লাট তখন মহারাণীর রাজত্ব ৬০ বৎসর পূর্ণ হয়। সেইজন্য তাঁহার রাজ্যের সকল অংশে “হীরক জুবিলী” উৎসব হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সকল স্থানের প্রজারাই মহানন্দে উৎসব করিয়াছিলেন।

গড়ের মাঠে শিল্পের মেলা।

লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপন আমাদের বড়লাট হন। তিনি ভারতবর্ষের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন, কি কার্য্য করিলে প্রজার মঙ্গল হইবে, কিরূপে তাহাদের উন্নতি হইবে, সেই বিষয়ই তিনি নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মহামতি লর্ড রিপনকে এদেশের লোক দেবতার ন্যায় মনে মনে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার গড়ের মাঠে "ইণ্টার ন্যাশন্যেল এগজিবিসন্" বা "আন্তর্জাতিক মহামেলা" হয়। এই শিল্পপ্রদর্শনীর সময়ে কলিকাতার গড়ের মাঠের কিয়দংশ যেন ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে হইত। এই উপলক্ষ্যে নানা দেশ হইতে শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্য ও নানাবিধ কল-কারখানা প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল।

এই শিল্পের মেলায় ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে কারিকরেরা আসিয়া কিরূপ করিয়া তাহাদের কার্য্য করে, তাহা দেখাইয়াছিল। বস্ত্র, কিংখাপ,* সতরঞ্চি ও গালিচা কিরূপ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা দেখান হইয়াছিল। ভারত-বর্ষে যত প্রকার আদিম জাতি আছে, তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের শিক্ষকগণ মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলি মেলায় রাখা হইয়াছিল। এই

---

* বারাণসীর রজতকাঞ্চন সূত্রে সংযুক্ত মণিমুক্তাখচিত বহুমূল্য কিংখাপের তুলনা ত্রিভুবনে নাই।

সকল জাতির অস্ত্র শস্ত্র, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেখান হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে নানা রকম দ্রব্য আসিয়াছিল।

এই সকল বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে কাচ প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা দেখান হয়। কিরূপ করিয়া নানা প্রকার কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হয়, কি প্রকারে কাচের উপর নাম লেখা, লতাপাতা কাটা, নানারূপ কাজকর্ম্ম করা হয়, তাহা দেখান হইয়াছিল। এই মেলায় সোনা রূপার অনেক প্রকার দ্রব্য ও গহনা, জড়োয়া গহনা, বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও হীরকাদি প্রদর্শিত হয়।

মেলার একস্থানে কিরূপ করিয়া হাওয়ার বন্দুক ছুঁড়িতে হয়, তাহা দেখান হইয়াছিল। যাহারা দেখিতে যাইত, তাহারা কিছু খরচ করিলেই বন্দুক ছুঁড়িতে পাইত। কিন্তু কেবলমাত্র শিখ ও গুর্খারাই প্রকৃত ভাবে বন্দুক ছুঁড়িতে পারিত। একস্থানে একটী যন্ত্রের ব্যাণ্ড ছিল, তাহাতে মধ্যে মধ্যে দম দিলে আপনি ব্যাণ্ড বাজিত, সেই সময়ে সেখানে অনেক লোকের জনতা হইত। মেলাটী বেষ্টন করিয়া একটী বাষ্পীয় ট্রামগাড়ী ছিল। এই ট্রামগাড়ী চড়িবার জন্য ভয়ানক জনতা হইত। মেলার উত্তর দিকে সুইচ্ ব্যাক্ রেলওয়ে ছিল, এই রেলের গাড়ীগুলি কতকটা ক্ষুদ্র ট্রামগাড়ীর ন্যায়। একটী উচ্চ স্থান হইতে ছাড়া হইত, গাড়ীগুলি নিম্ন স্থানে যাইয়া বেগে অপর একটী অল্প উচ্চ স্থানে উঠিয়া, পুনরায় নামিয়া তৃতীয় উচ্চ স্থানে যাইয়া থামিত। এই উঠানামার বেগেই গাড়ী চলিত এবং আরোহিগণ সেই সময়ে মহা আনন্দধ্বনি করিত।

লক্ষ্ণৌ ও মুর্শিদাবাদ হইতে হস্তীদন্তের মছলন্দ (মাদুর), পাখা, বাক্স, খেলনা, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, জন্তুর মূর্ত্তি, চামর, গহনা রাখিবার কেস, শীতলপাটী, আতর দান, গোলাপ-পাস ইত্যাদি এবং ভিজিগাপট্টম হইতে কাঁচকড়া, হস্তীদন্তের শিল্প; চন্দন, আবলুসকাষ্ঠ, সজারুকণ্টক ও ঝিনুকের নানা প্রকার দ্রব্য; বিবিধ সৌখীন জিনিষ; গন্ধ দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিশি রাখিবার কেস, পাখা ইত্যাদি আনা হইয়াছিল। জয়পুরের শ্বেত পাথরের তাজমহল, বিবিধ বাসন, খাট বিছানা, শ্বেত পাথর ও স্ফটিকের নানারূপ মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ ও নদীয়া হইতে যে সকল মৃত্তিকার দ্রব্য আসিয়াছিল, তাহাদের তুলনা নাই। লক্ষ্ণৌর মৃত্তিকাদ্রব্যের মধ্যে গুড়গুড়ি, গড়গড়া, হুকা, থালা, ঘটি, বাটী, মানুষের ব্যবহার্য্য যত প্রকার বাসনের প্রয়োজন, মানুষ হইতে যত প্রকার জীব জন্তু সমুদয়ের নমুনা আসিয়াছিল। জিনিষগুলি সুন্দররূপে গঠিত ও নানাবর্ণে চিত্রিত ছিল;—ভিস্তিতে রাস্তায় জল ছিটাইতেছে, আরদালী মনিবের কোন কাজে ব্যস্ত, ইংরাজের মুসলমান খানসামা কোন খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছে, কেহ হয়ত ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় চলিয়াছে, কোন ভদ্রলোক কোন স্থানে যাইতেছে, সাহেব মেম পদব্রজে চলিয়াছে; এই সকল মূর্ত্তি ও নানা প্রাকর পশুর মূর্ত্তি ছিল।

নদীয়ার বাসন অপেক্ষা মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। মানুষের মূর্ত্তি হইতে সমস্ত জীব জন্তুর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ছিল;—

আটচালায় কালীপূজা হইতেছে, ঢুলি ঢাক বাজাইতেছে, শ্মশানে শব দাহ হইতেছে, মানুষে মাছ ধরিয়াছে, ভদ্রলোক ছাতা হাতে, উড়ানী কাঁধে চলিয়াছে, কেরাণী বাবু ধুতি চাপকান পরিয়া চলিয়াছেন, বৃদ্ধ সাহেব মাছ গাঁথিয়াছে, এইরূপ নানাপ্রকার মূর্ত্তি আসিয়াছিল। লক্ষ্ণৌর মূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা নদীয়ার মূর্ত্তিগুলি অধিক সুন্দর ছিল।

দিল্লীর দরবার।

সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনমাত্র তিনি ইংলণ্ডের মহারাণী ছিলেন। লর্ড লিটন যখন আমাদের বড়লাট, তখন মহারাণী ভারতবর্ষের সম্রাট্ উপাধী গ্রহণ করেন। এই শুভকার্য্য উপলক্ষ্যে লর্ড লিটন দিল্লী নগরীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করিলেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করা হইল। এই রাজসূয়যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের সমুদয় রাজা মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকলের সমক্ষে রাজপ্রনিনিধি লর্ড লিটন নিজমুখে ঘোষণা করিলেন, যে অদ্য হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ হইল।

লর্ড কর্জ্জন যখন আমাদের বড়লাট তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও সমস্ত

সপ্তম এডওয়ার্ড

ইংরাজ সাম্রাজ্য শোকে মগ্ন হইল। মহারাণীকে সকলে মনে মনে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক যেন সত্য সত্যই মাতৃহারা হইয়াছিল। মাতৃশ্রাদ্ধে লোকে যেরূপ অর্থ ব্যয় করে, মহারাণীর মৃত্যু হইলে

লর্ড মিণ্টো।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে সেইরূপ মাতৃশ্রাদ্ধ হইল। দরিদ্র ও আতুরদিগকে অকাতরে অন্ন দান করা হইয়াছিল।

ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইলেন। এই উপলক্ষ্যে লর্ড কর্জ্জন দিল্লী নগরীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন

করিয়া সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন করেন।

মহামতি লর্ড হার্ডিঞ্জ এখন আমাদের বড়লাট। এ বৎসর মহা সমারোহে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের শুভ অভিষেক কার্য্য দিল্লী সহরে সম্পন্ন হইল। পূর্ব্বে আর কোন সম্রাটের অভিষেক কার্য্য ভারতবর্ষে সম্পন্ন হয় নাই। বালক বালিকাগণ! রাজা আমাদের ধন ও প্রাণের রক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিবে। তোমরা ঈশ্বরের নিকটে সম্রাট্ ও মহারাণীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী।

ইংলণ্ডের মালবিরা নামক রাজপ্রাসাদে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জন্ম হয়। তিনি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি যখন সূতিকাগৃহে ছিলেন, তখন সেই রাজপ্রাসাদে আগুণ লাগিয়াছিল। তাঁহার পিতা এডওয়ার্ড তাঁহাকে ও তাঁহার মাতা রাণী অলেকজান্দ্রাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়া স্বয়ং অগ্নি নির্ব্বাণ করেন। রাজার চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিতেছিল; তিনি স্ত্রী পুত্রকে বাঁচাইতে গিয়া নিজের জীবনের বিষয় একবারও ভাবেন নাই। শেষে দমকল আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র আলবার্ট রাজা হইবেন, সেই জন্য পিতা মাতা, তাঁহাকে একজন প্রধান নৌ-যোদ্ধা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে শিক্ষকের নিকট সমুদ্র জীবনের ভয়ানক বিবরণ সকল জর্জ্জ

একমনে শুনিতেন। শিক্ষক সেই সম্বন্ধে অনেক গল্প বলিতেন। তাঁহার শৈশবকাল গত হইলে, পাদ্রী ডেলটন তাঁহার শিক্ষার ভার লইলেন। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। রাণী আলেকজান্দ্রা, যে সমুদয় গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহাই পড়াইতে বলিতেন। চরিত্র গঠনের ভার মাতা নিজের উপর রাখিলেন। বাহিরের জাঁক জমক ও বৃথা ব্যয় মহাপাপ এই ভাবটী পুত্রের মনে ভাল করিয়া অঙ্কিত করিয়া দিলেন। বাবুগিরি ও আলস্য যে বড়লোকের সর্ব্বনাশের মূল তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বার বৎসর বয়সে ব্রিটানিয়ার যুদ্ধ জাহাজে তিনি নৌ-যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন। তিনি যে রাজপুত্র সেকথা তখন ভুলিয়া, দরিদ্র নাবিকদিগের সহিত দীন ভাবেই দিন কাটাইতেন। এই সময়ে তিনি সকল প্রকার আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন ; একদিন তিনি নিজের সঙ্গীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তোমরা আমাকে কুমার জর্জ্জ বলিয়া ডাকিও না। সঙ্গীরা এইবার সুযোগ পাইল, তাহারা জর্জ্জকে স্প্রাট্‌স (এক প্রকার মৎস্যের নাম) বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ইহার কিছু দিন পরে তিনি ব্যাকাণ্টি নামক যুদ্ধ জাহাজে যান। এখানে তিনি নিজের হাতে জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন পরিষ্কার করিতেন, রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতেন, ঝড় বৃষ্টির সময় মাস্তুলের উপর উঠিয়া পাল গুটাইতেন, মহাতুফানে জাহাজ হইতে নৌকা নামাইয়া দিতেন এবং দাঁড় বাহিয়া উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নৌকা লইয়া যাইতেন। যখন অন্য কোন

কার্য্য না থাকিত, তখন সিঙ্গা বাজাইতেন। তাঁহার অত্যন্ত সাহস ছিল। এক সময়ে তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরের এফেল টাওয়ার দেখিতে গিয়াছিলেন; টাওয়ারের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া তিনি দেখিলেন, চূড়ার উপর একটী দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড রহিয়াছে, তিনি সেই কাষ্ঠদণ্ড বাহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গীগণ ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

প্রিন্স আলবার্টের মৃত্যু হইলে জর্জ্জ যুবরাজ হইলেন। রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল; উভয়ে ইয়র্ক কটেজ নামক রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ এইখানে অনেক সুখের দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নিকটে যে সকল অনাথ ও দরিদ্র লোক বাস করিত, তিনি তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। যেদিন যে কাজ করিবেন বলিয়া তিনি সঙ্কল্প করিতেন, পর দিনের জন্য তিনি তাহা কখন রাখিয়া দিতেন না। কি সৌজন্যে, কি আচার ব্যবহারে, কি চালচলনে তিনি একজন আদর্শ ইংরাজ। তিনি অমায়িক, সরল, পরদুঃখকাতর, এবং সাহসী; তিনি কর্ত্তব্য পালন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হন না। পরিচিত বা বন্ধুব্যক্তির অভাব জানিতে পারিলে, তিনি তাহা মোচন করিয়া থাকেন। তিনি তোষামোদ ভাল বাসেন না, বরং অসন্তুষ্ট হন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মহারাণী মেরীও আসিয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী।

ইংলণ্ডের কেনসিংটন রাজপ্রাসাদে মহারাণী মেরীর জন্ম হয়। সাধারণ বালক বালিকার ন্যায় বাল্যকালে ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কেনসিংটন উদ্যানে তিনি খেলা করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের সহিত ধাত্রী থাকিতেন। বালিকা মেরী শিল্প, গীত, বাদ্য এবং ভাষা শিক্ষায় মনযোগ দিয়াছিলেন। তিনি সুন্দররূপে পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠের স্বরও চমৎকার। চারিটী ভাষায় তিনি অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার মাতাপিতা কেনসিংটন্ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া শ্বেতভবন নামক রাজপ্রাসাদে আসিয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে কুমারী মেরী সর্ব্বদাই মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি মাতার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য সকল কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। হাঁস-পাতালে বা অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তিনি পোষাক প্রস্তুত করিতেন। কখন কখন নিকটে যে সকল দরিদ্র লোক বাস করিত, তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন, কুমারী মেরী কঠোর পরিশ্রম করিতেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তিনি ইতিহাস পড়িতে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ ও মমতায় বুঝি মহারাণী মেরীর সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না। তিনি আপন ইচ্ছামত সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সন্তানগণকে স্বয়ং অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। সন্তানগণ যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।

মহারাণী মেরী যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মিষ্ট কথায় ও সদ্ব্যবহারে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করেন। সম্রাট্ ও মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম এডওয়ার্ড। ইনি এখন আমাদের যুবরাজ। বালক বালিকাগণ! তোমরা সকলে আমাদের সম্রাট্, মহারাণী ও যুবরাজের দীর্ঘ জীবন কামনা কর।

সমাপ্ত।